ভাষাতত্ত্ব-পরিচয়

ভাষাতত্ত্ব-পরিচয়

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের বি. এ. (সম্মান) ও
এম. এ. (প্রথম পর্ব) শ্রেণীর
সিলেবাস অনুসারে লিখিত

সাযযাদ কাদির
অধ্যাপক : সা'দত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
করটিয়া, টাংগাইল

৩৮/বাংলাবাজার/ঢাকা

LINGUISTICS FOR BEGINNERS

By
SAZZAD QADIR
PROFESSOR : SAADAT UNIVERSITY COLLEGE
KARATIA, TANGAIL

মূল্য ঃ ১০.০০

প্রকাশনায় ঃ

দেওয়ান আবদুল কাদের ॥ ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা

মুদ্রণে ঃ

প্রভাতী প্রেস ॥ ৫৪, বরদা গাঙ্গুলী লেন, ঢাকা

শিল্পী ঃ

আকবার্ট

প্রথম প্রকাশ ঃ

নভেম্বর ঃ ১৯৭৫

উৎসর্গ

মুনীর চৌধুরী
মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী
আনোয়ার পাশা

ভূমিকা

ভাষাতত্ত্ব-সম্পর্কিত বর্তমান ক্ষীণ গ্রন্থটি পরিচিতি-মূলক। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সম্মান ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন মিটিয়েও কৌতুহলী পাঠক যাতে প্রাথমিক জ্ঞান নিতে পারেন এ-গ্রন্থে সে-চেষ্টা করা হয়েছে।

গ্রন্থ রচনায় Irach J. S. Taraporewala প্রণীত Elements of the Science of Language, সুকুমার সেন প্রণীত 'ভাষার ইতিবৃত্ত', শ্রদ্ধেয় শিক্ষক রফিকুল ইসলাম প্রণীত 'ভাষাতত্ত্ব' ও সুকুমার বিশ্বাস প্রণীত 'ভাষা-বিজ্ঞান পরিচয়'—গ্রন্থ ক'টির প্রভূত সহায়তা লাভ করেছি। গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া দেখে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন অধ্যাপক আবদুল মজিদ। রচনাকালে আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আ. ফ. ম. খলিলুর রহমান, অধ্যাপক জওশন খান ও অধ্যাপক মাহবুব সাদিক।—এঁদের সকলের প্রতি রইলাম চিরকৃতজ্ঞ।

আকুরটাকুর, টাংগাইল
৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫

সাযযাদ কাদির

সূচীপত্র

এক

সংজ্ঞা ও বিষয় নির্দেশ ... ১

ভাষা/১

ভাষাতত্ত্ব/২

দুই

ভাষাতত্ত্বের বিবর্তন ... ৩

তিন

তুলনামূলক ভাষাবিচারের পদ্ধতি ... ৮

তুলনামূলক পদ্ধতি/৮

ঐতিহাসিক পদ্ধতি/৮

বর্ণনামূলক পদ্ধতি/৯

ভাষাতত্ত্বের শাখা/৯

ধ্বনিতত্ত্ব/১০

রূপতত্ত্ব/১১

রূপগত ধ্বনিতত্ত্ব/১১

বাক্যতত্ত্ব/১১

চার

ধ্বনি-পরিবর্তনের সাধারণ নিয়মাবলী ... ১২

ধ্বনি-পরিবর্তনের কারণ/১২

ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়ম/১৫

ধ্বনি-পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া/১৬

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধ্বনি-পরিবর্তনের সূত্র/২৩

গ্রিমের সূত্র/২৩

গ্রাসমানের সূত্র/২৪

বেরনেরের সূত্র/২৫

কোলিংসের সূত্র/২৬
অ্যাসকলির সূত্র/২৬
পাঁচ
সাদৃশ্যমূলক পরিবর্তন ... ২৭
ছয়
অর্থ পরিবর্তন ... ৩১
শব্দার্থতত্ত্ব/৩১
অর্থ পরিবর্তনের ধারা/৩৩
সাত
ভাষাঃ শ্রেণীবিভাগ ... ৩৭
রূপতাত্ত্বিক শ্রেণীবিভাগ/৩৭
অজৈব ভাষা/৩৮
জৈব ভাষা/৩৮
সর্বসমবায়ী ভাষা/৩৮
যৌগিক ভাষা/৩৯
সাধিত ভাষা/৪১
বৈশ্লেষিক ভাষা/৪১
বংশানুক্রমিক শ্রেণীবিভাগ/৪২
প্রধান ভাষা গোষ্ঠীসমূহ/৪৩
ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী/৪৪
পরিশিষ্ট ... ৪৮

এক

সংজ্ঞা ও বিষয় নির্দেশ

ভাষা
(LANGUAGE)

সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে মানুষ পারস্পরিক ভাষা বিনিময়ে অভ্যস্ত। মনের ভাব আদান-প্রদানের জন্যে মানুষ অর্থপূর্ণ যে ধ্বনিসমষ্টি ব্যবহার করে তাকেই বলা হয়েছে ভাষা। সুকুমার সেন বলেছেন, 'মানুষের উচ্চারিত, অর্থবহ, বহুজন-বোধ্য ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা'। মাকিন ভাষাতাত্ত্বিক ব্লক ও ট্রেগার বলেছেন, 'A language is a system of arbitrary vocal symbols, by means of which a social group co-operates' অর্থাৎ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ধ্বনি-প্রতীক সমষ্টির যে ব্যবস্থা দ্বারা কোন (ভৌগোলিক পরিবেশে) সমাজবদ্ধ মানুষ পরস্পর সহযোগী হয় তা-ই ভাষা।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিবেশে ও একাধিক ভাষার ব্যবহার থাকিতে পারে, আবার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক ও অন্যান্য কারণে এই পরিবেশ হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে একই ভাষা অন্যত্রও প্রচলিত হ'তে পারে।

স্থান, কাল ও পরিবেশগত বিভিন্নতার ফলে ভাষা রূপান্তরিত হয়। একটি বৃহৎ সমাজে প্রচলিত মূল ভাষা নানা কারণে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লাভ করে। একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে একটি নির্দিষ্ট ভাষা ব্যবহারকারী সম্প্রদায় বসবাস করলেও সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনে পরস্পরের মধ্যে যোগসূত্র সর্বত্র সমানভাবে দৃঢ় থাকে না, বিভিন্ন অঞ্চলে বাক্‌রীতি, ধ্বনি-উচ্চারণ-রীতি ও আঞ্চলিক ইডিয়ম-প্রয়োগের ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একই ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত অঞ্চলবিশেষে প্রচলিত স্বতন্ত্র ভাষা-ভঙ্গিকে বলে উপভাষা (Dialect)।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায়: মুখের ভাষাকেই ভাষা হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে, কিন্তু ভাষার লিখিত রূপও রয়েছে। কথ্য ভাষারই

ঈষৎ কৃত্রিম এবং স্থায়ী রূপ হচ্ছে লিখ্য ভাষা, লেখ্য ভাষার বাহন হচ্ছে লিপি, যাকে বলা যায় 'বাঙ্ময় ধ্বনির দৃশ্যরূপ'।

ভাষাতত্ত্ব

(LINGUISTICS/PHILOLOGY)

ভাষার বৈজ্ঞানিক পঠনপাঠন বা বিশ্লেষণকে বলে **ভাষাতত্ত্ব**।

ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ এবং ভাষায় ধ্বনি-সংগঠন, ধ্বনি-পরিবর্তন, ধ্বনি-সমাবেশে অক্ষর-সৃষ্টি, অক্ষর-সম্মিলনে বাক্যনির্মাণ, অর্থের পরিবর্তন ইত্যাদি পরীক্ষা করে ভাষার অন্তর্গত শৃঙ্খলার স্বরূপ বিশ্লেষণ করাই ভাষাতত্ত্বের কাজ। মুনীর চৌধুরী বলেছেন, ভাষাতত্ত্বের কাজ 'ভাষার অঙ্গ ব্যবচ্ছেদে, ভাষার অবয়ব-সংস্থানের শৃঙ্খলা আবিষ্কারে, তার ব্যবহার-প্রণালী বর্ণনায়'।

পৃথিবীর ভাষাসমূহের সাদৃশ্যগত একাত্মতা তথা জন্ম-রহস্য, ক্রমবিবর্তন ও গঠন-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভাষাতত্ত্ব আমাদের অবহিত করে। ভাষা-ব্যবহারের গুণ আছে বলেই মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব, সেই ভাষার রহস্য জানার দিকে আগ্রহ থাকাই স্বাভাবিক, এই আগ্রহেব ফলেই ভাষাতত্ত্বের সৃষ্টি।

ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় মুখের ভাষাই সর্বাধিক জরুরী ; কারণ মুখের ভাষার প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ পরীক্ষা করেই ভাষার সঠিক বিশ্লেষণ করা সম্ভব। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য : ভাষা ব্যবহারকারীর বক্তব্য ও উদ্দেশ্য নয়, প্রকাশ-মাধ্যমই ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্র। অর্থাৎ বক্তা কি বলছে বা কেন বলছে ভাষা-বিশ্লেষণে তা অনাবশ্যক, কিভাবে বলছে সেটাই আলোচ্য।

ভাষাতত্ত্বের বিবর্তন

ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রপাত হয় প্রাচীন ভারতে। বৈদিক যুগ থেকেই এর সূচনা লক্ষ্য করা যায়। 'সংহিতা' পাঠের জন্যে সমাসবদ্ধ পদগুলিকে আলাদা আলাদা করে যখন 'পদ'-রীতিতে সাজিয়ে ধ্বনিগত উচ্চারণ ব্যাখ্যাত হ'লো তখনই পৃথিবীর প্রথম ভাষাতাত্ত্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হ'লো। 'ব্যাকরণ' কথাটির জন্মও এ-সময়ে। বেদ-পাঠ-পদ্ধতি এরপর ব্যাখ্যা করা হয় 'প্রতিশাখ্য' গ্রন্থে, এ-গ্রন্থেই সর্বপ্রথম সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিসমূহ ও ব্যাকরণগত কারণে প্রয়োজনীয় শব্দসমূহকে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। বেদের শব্দতত্ত্ব নিয়ে এরপর উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেন যাস্ক, তাঁর 'নিরুক্ত' গ্রন্থে। যাস্কের দীর্ঘকাল পরে ভারত তথা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ পাণিনির আবির্ভাব। তিনি সংস্কৃত ভাষা বিশ্লেষক, একই সঙ্গে নির্দেশকও বটে। তাঁর বিশ্লেষণ ও বিন্যাসের মূলে রয়েছে চোদ্দটি 'বিধিসূত্র'। ধাতুরূপের আবিষ্কার, ভাষার এককরূপে বাক্য এবং বাক্যের তিনটি বিভাগ নির্ণয়েই নিহিত রয়েছে তাঁর অনন্যসাধারণত্বের প্রমাণ। ব্যাকরণতত্ত্বের অন্য দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি। যুগের পর যুগ ধরে পাণিনি-অনুসারীগণ ব্যাকরণ আলোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন জয়াদিত্য, বামন, ভট্টজী দীক্ষিত ও নাগজী ভট্ট। নদীয়ার বৈয়ায়িকগণও শব্দতত্ত্বের আলোচনা করেছেন, তাঁদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে। জগদীশ তর্কালঙ্কার-প্রণীত 'শব্দশক্তি প্রকাশিকা' এ-বিষয়ে প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা। সংস্কৃত ব্যাকরণ হিসেবে পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'র যে স্থান জৈন প্রাকৃতের ব্যাকরণ হিসেবে হেমচন্দ্র-রচিত 'শব্দানুশাসন'-এরও তেমনি গুরুত্ব। তবে তাঁর সংস্কৃত ব্যাকরণ ব্যর্থ হয়েছে। পতঞ্জলি তাঁর 'মহাভাষ্য' গ্রন্থে পাণিনি-পদ্ধতিকে সমর্থন ও বিশ্লেষণ করেছিলেন, বোপদেব 'মুগ্ধবোধ' গ্রন্থে ঐ পদ্ধতিকেই সরলীকৃত করেছেন। বাংলাদেশে এই 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণেরই স্থায়ী প্রতিষ্ঠা রয়েছে।

প্রাচীন ভারতে ব্যাকরণ-আলোচনা যেমন প্রসার লাভ করেছিল, প্রাচীন গ্রীসে তেমন ঘটেনি। অ্যারিসটোটলের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিন্যাস এবং প্লেটোর ধ্বনি-বিন্যাস অবশ্য উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু ইউরোপের প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন গ্রীক পণ্ডিত ডিয়োনিসিয়স থ্রাক্স (খৃষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দী), তাঁর রোমান ছাত্রদের জন্যে। থ্রাক্সের শিষ্যদের মধ্যে একজন, আপোলোনিয়াস ডিসকোলোস, রোমান ভাষার বাক্যরীতি নিয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেন। লাতিন ভাষার ব্যাকরণগুলির মধ্যে লরেনশিয়াস ভাল্লা (১৪৪০) রচিত ব্যাকরণটিই প্রসিদ্ধ, যার প্রভাব অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

কিন্তু তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের আলোচনা শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে, যখন সংস্কৃত ভাষা ও তার ব্যাকরণ ইউরোপীয় পণ্ডিতদের গোচরে আসে। এ. ভি. ডবলিউ. জ্যাকসনের ভাষায় বলা যায়: 'Comparative Philology was born on the day when Sanskrit was opened to the eyes of the western world' (Philology, পৃঃ ৯)। এই আলোচনার ভিত্তি স্থাপন করেন স্যার উইলিয়ম জোন্স (১৭৪৬—'৯৪), ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আয়োজিত অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে তিনি মন্তব্য করেন: গ্রীক, লাতিন, জর্মন, কেলটিক, ফারসী ও সংস্কৃত—এই ভাষাসমূহে এমন সাদৃশ্যবাচক ঐক্য রয়েছে যা তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি আমাদের মনোযোগী ক'রে তোলে, সম্ভবত ঐ ভাষাসমূহের একই উৎসস্থল রয়েছে।

এই ইঙ্গিতের পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপীয় পণ্ডিতমহলে যে ব্যাপক গবেষণা হয় তারই ফলে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে পড়ে। এই পদ্ধতির আলোচনাই কালক্রমে তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করে।

জোন্স-প্রদর্শিত পথে প্রথম ইংরেজ গবেষক হলেন হেনরি টমাস কোলব্রুক (১৭৬৫—১৮৩৭)। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের ব্যাপক গবেষণা শুরু হয় জর্মনে। জর্মন গবেষকদের পুরোধা হলেন ফ্রিডরিখ শ্লেগেল (১৭৭২—১৮২৯)। তিনিই তুলনামূলক পদ্ধতির আলোচনা কিভাবে হওয়া উচিত তা প্রথম নির্দেশ করেন। তাঁর বিখ্যাত 'On the Language and the Wisdom of the Indians'

গ্রন্থেই সর্বপ্রথম 'তুলনামূলক ব্যাকরণ' কথাটি ব্যবহৃত হয়। তবে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সত্যিকারের প্রতিষ্ঠাতা হ'লেন ফিলহেল্‌ম ফন হামবোল্ড্‌ট (১৭৬৭—১৮৪৫)। ইউরোপে সংস্কৃত ভাষাতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা হ'লেন অ্যাডল্‌ফ শ্লেগেল (১৭৬৭—১৮৪৫), যিনি ফ্রিডরিখ শ্লেগেলের সুযোগ্য ভাই ও সহযোগী।

ফ্রান্‌ৎস বপ (১৭৯১—১৮৬৭) হ'লেন প্রথম সংস্কৃত, যেন্দ, গ্রীক, লাতিন, লিথুয়ানীয়, গথিক ও জর্মন ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণের প্রণেতা। প্রাথমিক আলোচনায় যে সীমাবদ্ধতা থাকে তা থেকে অবশ্য তিনি মুক্ত নন। শিশুতোষ রূপকথার বিখ্যাত লেখক জাকব গ্রিম (১৭৮৫—১৮৬৩) প্রথম ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে জর্মন ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন। জর্মন ভাষায় দু'টি ধ্বনি-পরিবর্তন সূত্র প্রণয়নের জন্যেও তিনি বিখ্যাত।

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অন্যতম বিশেষজ্ঞ রাসমুস ক্রিশ্চিয়ান রাস্ক (১৭৮৭—১৮৩২) আইসল্যাণ্ডের ভাষার উৎস নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁর অ্যাংলো-স্যাক্সন ব্যাকরণ একটি প্রসিদ্ধ রচনা। গ্রিমের আগেই রাস্ক জর্মন ভাষার ধ্বনি-পরিবর্তন সূত্র উদ্ভাবন করেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম জরথুস্ত্র যে ভাষায় তাঁর বাণী দিয়েছিলেন তাকে 'আবেস্তা' ব'লে নির্ণয় করেন।

ইউজীন বারনফ (১৮০১—'৫২) ইউরোপের প্রথম সংস্কৃত ভাষার শিক্ষক। ১৮২৬ সালে তিনি পালি-ভাষা বিষয়ক যে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন তার মাধ্যমেই ইউরোপে প্রথম বুদ্ধের মূল বাণীসমূহ গিয়ে পৌঁছয়। ১৮৩৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত 'Commentaire sur le yacna' গ্রন্থটি, যাকে আবেস্তা-ভাষার ওপর প্রথম নির্ভুল ও ব্যাপক গবেষণা মনে করা হয়। বাণমুখ লিপি নিয়েও তিনি উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন।

শব্দতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক গবেষণা-পদ্ধতির সূত্রপাত করেন অগষ্ট পট (১৮০২—১৮৮৭)। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ব্যবহৃত পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত শব্দ ও ধ্বনির প্রথম তালিকা তিনিই প্রণয়ন করেন।

ফ্রিডরিখ মাক্সমুলার (১৮২৩—১৯০০) তুলনামূলক পুরাণ ও ধর্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা। ভারতীয় ভাষাসমূহের প্রতি ছিল তাঁর অসামান্য মনোযোগ, ১৮৫৪ সালে তিনি দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র মুণ্ডা ভাষার অস্তিত্ব প্রমাণ করেন।

বিখ্যাত 'St. Petersburg Dictionary of Sanskrit'-এর প্রণেতা হলেন রুডলফ রথ (১৮২১—'৯৫) ও অটো ব্যেহংলিঙ্ক (১৮১৫—১৯০৪)। এই গ্রন্থে সংস্কৃত শব্দগুলির মূল নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া আবেস্তা-পাঠ নির্ণয়ে সংস্কৃত ভাষার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে, বেদ-বিশেষজ্ঞ রথ তা ঠিকই অনুমান করেছিলেন। এজন্যেই তিনি আবেস্তা-ভাষার স্বরূপ নির্ণয়ের জন্যে এ যাবৎকাল ব্যবহৃত পহ্লবী-পদ্ধতি বর্জন করেছিলেন।

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিশ্লেষণে ও আলোচনায় যতোখানি অগ্রগতি লাভ করেছিলো তার সার সংগ্রহ করেন অগস্ট শ্লেইশের (১৮২৩—'৬৮)। 'Compendium' গ্রন্থটিতে রয়েছে 'Portrait sketch of each member of the Indo-European family, with an outline picture of the Aryan mother in the background.'

বি. ডেলব্রুক তুলনামূলক বাক্যতত্ত্বের পদ্ধতি প্রণয়ন করেন। গ্রীক, লাতিন ও সংস্কৃত ভাষায় ছিল তাঁর অসামান্য দক্ষতা।

জেমস প্রিনসেপ (১৭৯৯—১৮৪০) খরোষ্ঠী-লিপির পাঠ-উদ্ধারের অন্যতম পথিকৃৎ। তবে ব্রাহ্মী-লিপির ভাষা-উদ্ধার ও তার বর্ণমালা-বিন্যাসের (১৮৩৭) জন্যেই তিনি অধিকতর বিখ্যাত।

সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধ'রে আরো অনেক গবেষক পৃথিবীর ভাষাসমূহের স্বরূপ নির্ণয়ে যত্নবান হন। তাঁদের আলোচনার ফলেই বিভিন্ন বিবর্তনের পথ ধ'রে তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক পদ্ধতি ভাষাতত্ত্বের একটি উল্লেখযোগ্য শাখায় পরিণত হয়। কারণ এই পদ্ধতি দ্বারাই পৃথিবীর ভাষাসমূহকে শ্রেণীবিন্যাস ক'রে কয়েকটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা সম্ভব হয়।

পাণিনি তাঁর ব্যাকরণ রচনায় সংস্কৃত ভাষাকে যেভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন তা নিয়ে পরবর্তীকালে ব্যাপক গবেষণা চলে। ফলে বর্ণনামূলক নামে আরেকটি ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে উদ্ভূত হয়। এই পদ্ধতি ভাষার ধ্বনি, রূপ ও বাক্যসংগঠনের বিশ্লেষণেই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে, শব্দ বা বাক্যের অর্থ নিয়ে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক পদ্ধতির যে ব্যাপক অনুশীলন এখানে তা উপেক্ষা করা হয়। বর্ণনামূলক পদ্ধতির বিকাশের মূলে রয়েছে রুশ পণ্ডিত বাউদুইন দ্য কুরতিনে, ফরাসী পণ্ডিত ফারদিনাঁদ দ্য সস্যুর, মার্কিন

পণ্ডিত লিওনার্ড ব্লুমফীল্ড প্রমুখের ব্যাপক গবেষণা।

বর্তমানে তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক পদ্ধতি অভিন্ন চারিত্র্য অর্জন করেছে এবং বর্ণনামূলক পদ্ধতিও সেখানে সহায়ক হ'য়ে উঠেছে। ভাষাতাত্ত্বিক লিওনার্ড ব্লুমফীল্ড ভাষাতত্ত্ব তথা তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক পদ্ধতির সাম্প্রতিক বিবর্তন সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য : ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক আলোচনা ও বিশ্লেষণ-পদ্ধতির মূল ভিত্তি হবে বর্ণনামূলক পদ্ধতি।

তুলনামূলক ভাষাবিচারের পদ্ধতি

ভাষাতত্ত্ব আলোচনার পদ্ধতি তিনটি ঃ

তুলনামূলক (Comparative)
ঐতিহাসিক (Historical)
বর্ণনামূলক (Descriptive)

ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদগণ তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন ; পাণিনি, পতঞ্জলি প্রমুখ ভারতীয় বৈয়াকরণগণ ছিলেন বর্ণনামূলক পদ্ধতির অনুসারী ।

তুলনামূলক পদ্ধতি

রূপ ও ধ্বনিতত্ত্বের ভিত্তিতে এক ভাষার সাথে অন্য একটি ভাষার তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে সগোত্রতা আবিষ্কার করা যায় তাকেই তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতি বলা হয় ।

সংস্কৃত⁰ নব=ফারসী⁰ নও ; সং⁰ দেব=ফা⁰ দেও ;
ইংরেজী⁰ ব্যাড=ফা⁾ বদ ; আরবী⁰ দেশ্‌ৎ=ইং⁾ Desert.

এ-রকম সাদৃশ্য নৈমিত্তিক। তুলনামূলক পদ্ধতিতে নৈমিত্তিক সাদৃশ্য পরীক্ষিত হয় বটে কিন্ত তা গুরুত্বপূর্ণ নয় ; তুলনীয় ভাষাদ্বয়ের একার্থদ্যোতক শব্দ ; ধ্বনিগত পরিবর্তনসহ, এ-ক্ষেত্রে বিচার্য হবে । যেমন :

সং⁰ গো=লাতিন⁰ Gwous=ইং⁰ Cow

তুলনামূলক পদ্ধতিতে যে দু'টি ভাষার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয় সর্বাগ্রে তাদের কালগত ঐক্য নির্ধারণ করে নেয়া প্রয়োজন । এজন্যেই রুডলফ রথ আবেস্তা-ভাষা বিচারের ক্ষেত্রে বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার প্রতি তুলনা গ্রহণ ও আবেস্তা অপেক্ষা অনেক পরবর্তীকালের পহ্লবী-পাঠ বর্জন করেছিলেন ।

ঐতিহাসিক পদ্ধতি

কোন ভাষায় শব্দের যে কালক্রমিক ধ্বনি ও রূপগত পরিবর্তন হয় সে

আলোচনা ও বিচারকে ঐতিহাসিক পদ্ধতি বলে।

ভগিনী>বগ্‌হিনী>বহিন>বোন।

'ভগিনী' শব্দের ক্রমবিবর্তনের ফলে 'বোন' শব্দের উৎপত্তি। এই বিবর্তনের ধারা ও সূত্র নির্ণয়ই ঐতিহাসিক পদ্ধতির কাজ। ফলে একটিমাত্র ভাষার আলোচনাই এ পদ্ধতিতে স্থান পায়। তুলনামূলক পদ্ধতিতে অনেক সময় যেমন কোন শব্দের বিশেষ কোন সময়ের রূপ আবিষ্কৃত না হ'লে তা কল্পনা ক'রে নেয়া হয় এ-পদ্ধতিতে তেমন কোন সুযোগ নেই। তুলনামূলক পদ্ধতির মতো ঐতিহাসিক পদ্ধতিকেও অনেকাংশে লেখ্য ভাষার ওপর নির্ভরশীল হ'তে হয়। কারণ প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভাষার কথ্যরূপের কোন নিদর্শন পাওয়া অসম্ভব, এজন্যেই প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে ভাষার যে লিখিত রূপ পাওয়া যায় তা-ই এ-ক্ষেত্রে অবলম্বিত হয়। ঐতিহাসিক ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতির জ্ঞান তাই প্রাচীন সাহিত্য-পাঠে সহায়ক হয়ে ওঠে।

বর্ণনামূলক পদ্ধতি

বর্ণনামূলক পদ্ধতি মৌখিক ভাষার আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ করে। ভাষার মূল কাঠামোতে রূপ ও বাক্য, ধ্বনি ও রূপধ্বনির যে রীতি বিদ্যমান, সেই সঙ্গে ধ্বনির উচ্চারণ ও শব্দের অর্থ যে ভূমিকা পালন করে তার বিচার-বিশ্লেষণই বর্ণনামূলক পদ্ধতির কাজ। ভাষায় ধ্বনিমূলের অবস্থান ও সমাবেশ বিচার থেকেই এ-পদ্ধতির কাজ শুরু হয়। ফলে যে-কোন ভাষার বর্তমান রূপ বিশ্লেষণ করে তার ব্যাকরণ তৈরী করা বর্ণনামূলক পদ্ধতির সাহায্যেই সম্ভব। তবে বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বে যৌগিক ভাষার সকল রূপের বিশ্লেষণ প্রয়োজনীয় নয়, কতকগুলি নির্দিষ্ট ধ্বনির নিয়মিত বিশেষত্বের দিকেই তার লক্ষ্য থাকে। ফলে ব্যক্তিবিশেষের উচ্চারণ-ভঙ্গিতে কোন নিজস্বতা থাকলে তা উপেক্ষিত হয়।

ভাষাতত্ত্বের শাখা

তুলনামূলক, ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব ভাষাবিচারের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অবলম্বন করে তার কয়েকটি পর্যায় রয়েছে। এই পর্যায়ের সংখ্যা চারটি :

ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)

রূপতত্ত্ব (Morphology)

রূপগত ধ্বনিতত্ত্ব (Morphophonemics)

বাক্যতত্ত্ব (Syntax)

উপরোক্ত শাখাগুলির সাহায্যে ভাষাকে বিশ্লেষণ করা হয় ব'লে ঐতিহাসিক তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব অধুনা বিজ্ঞানসম্মত হয়ে উঠেছে। আগে কেবল বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বকেই প্রামাণ্য বৈজ্ঞানিক বলা হতো। ঐতিহাসিক তুলনামূলক পদ্ধতির আরো বৈজ্ঞানিকতার সাম্প্রতিক কারণ তাতে বর্ণনামূলক পদ্ধতির অন্তর্ভুক্তি।

ধ্বনিতত্ত্ব

ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আবার দু'টি পর্যায় রয়েছে :

ধ্বনির উচ্চারণ ও শ্রুতি বিচার (Phonetics)

ধ্বনির ব্যবহার বিচার (Phonemics)

ধ্বনির উচ্চারণ ও শ্রুতি বিচার

এই পর্যায়ে ভাষায় যে সমস্ত ধ্বনি রয়েছে তাদের উচ্চারণস্থান ও উচ্চারণরীতি বিশ্লেষণ করা হয়। বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধ্বনিসমূহের বৈশিষ্ট্য উদঘাটন ক'রে তাদের শ্রেণীবদ্ধ করাই এ রীতির কাজ। এ-রূপ বিশ্লেষণ দ্বারাই বাঙলা ভাষার ধ্বনিগুলিকে স্বর, অর্ধস্বর, দ্বি-স্বর, ব্যঞ্জন, অর্ধব্যঞ্জন ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত করা সম্ভব হয়েছে। ধ্বনি-পরিবর্তনে স্বরাঘাতের কি ভূমিকা এই পর্যায়ে তার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়।

ধ্বনির ব্যবহার বিচার

এই পর্যায়ে ভাষায় অন্তর্নিহিত ধ্বনিমূল ও সহধ্বনিগুলি সন্ধান করে তাদের চিহ্নিত করা হয়, সেইসঙ্গে অবস্থান ও পরিবেশগত কারণে তাদের ব্যবহারে যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় তাতে কোন নিয়ম বা শৃঙ্খলা রয়েছে কিনা তা-ও পরীক্ষিত হয়। ধ্বনিমূল ও সহধ্বনির সংজ্ঞা নিম্নরূপ ঃ

ধ্বনিমূল ঃ অর্থহীন ন্যূনতম ধ্বনি একক (Phoneme : Minimum meaningless sound unit) :

সহধ্বনি (Allophone) : ধ্বনিমূলের অবস্থান ও পরিবেশগত কারণে রূপান্তরিত ধ্বনির নাম সহধ্বনি।

রূপতত্ত্ব

বাক্যস্থিত পদের গঠনরীতি বিচারই রূপতত্ত্বের একমাত্র কাজ নয়, ধ্বনিতত্ত্বে যেমন ধ্বনিমূলকে একক ধ'রে ভাষার সমগ্র ধ্বনি-সংগঠনকে বিশ্লেষণ করা হয় রূপতত্ত্বে তেমনি রূপমূলকে একক ধ'রে ভাষার সমগ্র রূপ সংগঠনের বিশ্লেষণ করা হ'য়ে থাকে। সহধ্বনির মতো এখানেও রয়েছে সহরূপ।

রূপমূল ও সহরূপের সংজ্ঞা নিম্নরূপ ঃ

রূপমূল ঃ অর্থময় ন্যূনতম ধ্বনি একক (Morpheme : Minimum meaningful sound unit)।

সহরূপ (Allomorph) : রূপমূলের অবস্থান ও পরিবেশগত কারণে রূপান্তরিত রূপের নাম সহরূপ।

রূপগত ধ্বনিতত্ত্ব

রূপমূলে কখনো-কখনো যে ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটে রূপগত ধ্বনিতত্ত্বের পর্যায়ে তার বিশ্লেষণ করা হয়। ফলে ভাষার ধ্বনিসংগঠন ও রূপসংগঠনের মধ্যে ভাষাতত্ত্বের এই শাখাটি উপযুক্ত দৌত্য করে থাকে।

বাক্যতত্ত্ব

বাক্যতত্ত্ব বাক্যস্থিত পদের বিন্যাস বিশ্লেষণ করে বটে, কিন্তু রূপমূল ও রূপমূল-সংগঠিত শব্দসমূহের পারস্পরিক অবস্থানের নিয়ম ও রীতি বিশ্লেষণই তার মুখ্য কাজ। কারণ বাক্যগঠনরীতি দ্বারাও অনেক সময় রূপসংগঠনে ব্যবহার-বৈচিত্র্য সূচিত হয়। ফলে ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় বাক্যতত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব অনেক সময় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে।

ধ্বনি-পরিবর্তনের সাধারণ নিয়মাবলী

ধ্বনি-পরিবর্তনের কারণ

প্রকৃতির সবকিছুর মতো ভাষাও পরিবর্তনশীল। ভাষার পরিবর্তন মূলত ধ্বনির পরিবর্তন। কারণ ধ্বনির পরিবর্তনে রূপ তথা বাক্য সংগঠনও পরিবর্তিত হয়। শুধু তাই নয় ধ্বনি-পরিবর্তন কখনো কখনো অর্থেও পরিবর্তন আনে। এভাবেই ধ্বনি-পরিবর্তন ভাষার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ ধ্বনি-পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণ অনুমান করেন। তবে সে-সব অনুমানের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। কারণ উত্তরাধিকার-সূত্রে আমরা যে পরিবর্তিত ধ্বনিসমূহ লাভ করেছি কবে কখন কার দ্বারা কিভাবে তাদের সৃষ্টি সে-প্রমাণ কালের গর্ভে বিলীন হয়েছে। তবে এ অনুমানের সংগত কারণ রয়েছে যে ধ্বনি-পরিবর্তনে ব্যক্তিবিশেষের অবদানই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

ব্যক্তিবিশেষের উচ্চারণ-বৈষম্যের কারণ হিসেবে এগুলিকে নির্দেশ করা যায়: ভাষা ব্যবহারকারীর উচ্চারণে সহায়ক বাগ্‌যন্ত্রসমূহের ত্রুটি, দ্রুত কথনভঙ্গি, শ্রোতার দুর্বল শ্রুতি, ব্যক্তিবিশেষের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁর উচ্চারণ-ভঙ্গিঅনুকরণ, পরিচিত অন্য ভাষা বা উপভাষার ধ্বনিগত প্রভাব ইত্যাদি। বাঙলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুজরাটি ভাষায় নরসিংরাও দিবাতিয়া, ইংরেজি ভাষায় লর্ড ডানড্রিয়ারি প্রমুখ ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট উচ্চারণ-ভঙ্গি দ্বারা অনেক ধ্বনি-পরিবর্তন সূচিত করেছেন।

শিশুর ভাষা-শিক্ষা ঘটে অনুকরণের মাধ্যমে। সে পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজন দাস-দাসীর কথাই অনুসরণ করে। তাদের ভাষারীতিতে উচ্চারণ ও পদপ্রয়োগগত বিকৃতি থাকলে সে তা-শুদ্ধ শেখে এবং পরে নিজেও ব্যবহার করতে থাকে। এভাবে সে পরবর্তী পুরুষ পর্যন্ত ঐ বিকৃতিকে পৌঁছে দেয়।

ব্যক্তি থেকে পরিবারে, পরিবার থেকে গোষ্ঠীতে, গোষ্ঠী থেকে সমগ্র ভাষা-সম্প্রদায়ে একটি একটি পরিবর্তন এমনি ক'রেই সঞ্চারিত হয় এবং প্রসার লাভ করে। কালক্রমে সর্বজনগ্রাহ্য হ'য়ে এই প্রসারতা ভাষায় প্রতিষ্ঠিত হয়, স্থায়িত্ব অর্জন করে এবং পরবর্তী পরিবর্তনের অপেক্ষায় থাকে।

ধ্বনি-পরিবর্তনে রাজনীতি, ধর্ম, অর্থনীতি ইত্যাদিও কারণরূপে ব্যাখ্যাত হয়। এসব কারণেই এক ভাষা-সম্প্রদায়ের মানুষ ভিন্নভাষী সম্প্রদায়ের সাহচর্যে আসে। এই সংস্রব ঘনিষ্ঠ হ'লে হীনতর ভাষা উন্নততর ভাষা থেকে শব্দ ও বিশিষ্ট পদপ্রয়োগরীতি গ্রহণ করে থাকে। মধ্যযুগে বাংলাদেশ মুসলিম শাসনে আসে, ফলে তৎকালীন রাজভাষা ফারসী বাঙলা ভাষাকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করে। এ প্রভাবের সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ রয়েছে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে ও দোভাষী পুথি সাহিত্যে। আবার ইংরেজ শাসনের ফলে রাজভাষা ইংরেজিও একইভাবে বাঙলা ভাষায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। একই সময়ে পর্তুগীজ মিশনারী-বাহিত অনেক শব্দ বাঙলা ভাষায় স্থান করে নেয়। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের পর বাংলাদেশে আগত মোহাজের সম্প্রদায়ের সংস্রবও ধ্বনি-পরিবর্তনে ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সাংস্কৃতিক প্রভাবও একটি ভাষার পরিবর্তনশীলতায় সহায়ক হ'তে পারে। এই প্রভাবের ফলেই সংস্কৃত ভাষার প্রতি হিন্দু বাঙালী ও আরবী-ফারসীর প্রতি মুসলমান বাঙালীর পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়, ভাষায় শব্দ-ব্যবহারে এই পক্ষপাতিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। 'অল ইনডিয়া রেডিও'র উরদু অনুষ্ঠানের সঙ্গে রেডিও পাকিস্তানের উর্দু অনুষ্ঠানের তুলনা করলে দেখা যাবে : ভারতীয় উরদুতে সংস্কৃত ও হিন্দী শব্দ অধিক পরিমাণে ব্যবহারের যে প্রবণতা, পাকিস্তানী উরদুতে বেশি-বেশি আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারের জন্যে রয়েছে তেমনি প্রবণতা। কাজেই দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি কারণে এক ভাষায় অন্য ভাষার শব্দ স্থান করে নেয়, এই শব্দগুলিকে বলে কৃতঋণ শব্দ। 'হাওয়া' 'বাতাস' দোয়াত' 'সংযম' (যম=ধর্মরাজ) 'টেবিল' 'চেয়ার' 'আলমারি' 'আনারস' 'চা' প্রভৃতি কৃতঋণ শব্দগুলি বাঙলা ভাষায় অহরহ ব্যবহৃত হয়। এ-জাতীয় শব্দ অনেক ধ্বনি-পরিবর্তনের জন্য দায়ী, কারণ শব্দের অনুষঙ্গে তার বিশিষ্ট প্রয়োগরীতিও অন্য ভাষায় অনুপ্রবেশ করে।

সাহিত্যে রচনারীতির যেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা, ভাষা তথা ধ্বনিবিকারেও তার ভূমিকা প্রায় তেমন। চিরায়ত ও লোকায়ত—এই দু'টি রীতির কোন একটির প্রতি কোন-কোন সাহিত্যিকের বিশেষ প্রীতি থাকে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ফররুখ আহমদ প্রমুখের পাশাপাশি প্যারীচাঁদ মিত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, কাজী নজরুল ইসলাম, সৈয়দ মুজতবা আলী প্রমুখের রচনা-পাঠে এই পার্থক্য স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। ক্লাসিক-প্রীতি একজনকে পুরনো শব্দের নবায়নে উৎসাহিত করে, লোকায়ত ভাষায় প্রীতিবশত অন্যজন ব্যবহারযোগ্য লোকজ শব্দের আবিষ্কারে সচেষ্ট হন। একজন 'অপাপবিদ্ধম্‌স্নাবির' জাতীয় শব্দে তৃপ্তি বোধ করেন, অন্যজন 'উম' এই আঞ্চলিক শব্দে কাব্যিক ব্যঞ্জনা-সৃষ্টির প্রয়াসী। বিদেশী ভাষারীতির অনুকরণও কোন-কোন সাহিত্যিক করে থাকেন। বুদ্ধদেব বসুর ইংরেজি গদ্যরীতি ও কমলকুমার মজুমদারের ফরাসী গদ্যরীতি অনুসরণ-প্রচেষ্টা এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

শ্বাসাঘাতের স্থান পরিবর্তনের জন্যেও অনেক সময় ধ্বনিতে পরিবর্তন আসে। বাক্যে ব্যবহৃত সবগুলি পদে, উচ্চারণকালে, আমরা যেমন সমান জোর দেই না, তেমনি পদান্তর্গত অক্ষরগুলিও সমভাবে উচ্চারণ করি না। একটি অক্ষর থেকে অন্য একটি অক্ষরে জোর বেশি পড়লে শব্দে ঐ অক্ষরটিই মুখ্য হয়ে ওঠে, ফলে অন্য একটি অক্ষর লুপ্ত হতে পারে। যেমন, অলাবু > লাউ।

ধ্বনি-পরিবর্তনে সাদৃশ্যগত পরিবর্তনেরও যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। উচ্চারণ-সাম্যের সুযোগে এক পদের আকার অন্য পদে আরোপিত হতে পারে, একেই বলে **সাদৃশ্য**। 'টিউব-ওয়েল' শব্দটি বাঙলায় 'টিপকল' হয়েছে (টিউব > টিপ) 'টিপ' শব্দের সাদৃশ্যে, কারণ এই কল টিপলে জল পাওয়া যায়।

কোন ভাষা-সম্প্রদায় যে **ভৌগোলিক অবস্থানে** বসবাস করে সেই অবস্থানকে ধ্বনি-পরিবর্তনের পরোক্ষ কারণ হিসেবে নির্দেশ করা হয়। ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর দেশের আবহাওয়া ও খাদ্যাভাস অনেকখানি নির্ভরশীল, এবং এ-সবের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে দেশবাসীর 'দেহচর্চা, শরীর-প্রক্রিয়া, উচ্চারণে মুখপ্রযত্ন' ইত্যাদির ওপর। তদুপরি যাতায়াতের অব্যবস্থা একই ভাষা-সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব সূচিত করে। এ-সব কারণে একই ধ্বনি-

উচ্চারণে স্থানবিশেষে অল্পবিস্তর পার্থক্য থাকা অসম্ভব নয়।

লেখ্য ভাষা কৃত্রিম ব'লে তাতে ঐক্য বজায় থাকে, কিন্তু মুখের ভাষায় ঐ সুষমতা থাকে খুব কম। বিভিন্ন উপভাষা মিলেই একটি ভাষা এবং একটি উপভাষা কিছু-না-কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্যে অন্য উপভাষা থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। উপভাষাসমূহের এই বৈশিষ্ট্যের মূলে রয়েছে ঐ উপভাষা-এলাকার সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি বা পরিবারের বিশিষ্ট উচ্চারণ-ভঙ্গি। এ-ভাবে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ ধ্বনি-পরিবর্তনের মূল কারণ অনুমান করেন: কোন ব্যক্তি বা পরিবারের বিশেষ বাচনভঙ্গি। কিন্তু এ-মত প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়োজনীয় উপাদান এখন অতীত, পুনরুদ্ধারহীন অবস্থায় লুপ্ত। সম্ভবত এ-জন্যেই লিওনার্ড ব্লুমফীল্ড মন্তব্য করেছেন: '…The causes of sound-changes are unknown.'

ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়ম

ভাষার পরিবর্তনশীলতার মূলে রয়েছে ধ্বনি-পরিবর্তন, আর ধ্বনির পরিবর্তন ব্যক্তিবিশেষ দ্বারাই সাধিত হয়। বিশেষ পর্যবেক্ষণ দ্বারা ধ্বনির এই পরিবর্তনগুলির মধ্যে কতকগুলি নিয়ম আবিষ্কার করা যায়। ঐ নিয়মগুলিকে সূত্রাকারে সংজ্ঞাসহ উপস্থাপিতও করা সম্ভব।

যেমন, সংস্কৃত 'মধু' ও 'বধূ' শব্দ দু'টি থেকে বাঙলায় 'মউ' ও 'বউ' শব্দ দু'টি উৎপন্ন হয়েছে। এই পরিবর্তনকে সূত্রাকারে এ-ভাবে নির্দেশ করা যায়: দুই স্বরধ্বনির মধ্যস্থিত সংস্কৃত 'ধ' ব্যঞ্জনধ্বনিটি আধুনিক বাঙলায় লুপ্ত হয়।

ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মে ব্যতিক্রম থাকে, তবে ব্যতিক্রমের কারণ ব্যাখ্যা করা দুঃসাধ্য নয়।

যেমন, সংস্কৃত° বিডাল, আডম্বর > বাঙলা° বিড়াল, আড়ম্বর।

এখানে এই সূত্রের প্রয়োগ হবে: সংস্কৃত পদমধ্যবর্তী ড-কার বাঙলায় ড়-কারে পরিণত হয়।

কিন্তু, সংস্কৃত° দণ্ড, ষণ্ড > বাঙলা দাণ্ডা (ডাণ্ডা), ষণ্ডা।

এখানে উপরোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে। সংস্কৃত ড-কার বাঙলায় অপরিবর্তিত রয়েছে। এই ব্যতিক্রমের কারণ সূত্রাকারে এ-ভাবে নির্দেশিত হবে:

অব্যবহিত পূর্বে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে পরবর্তী স্বরকে দীর্ঘায়িত ক'রে সংস্কৃত ড-কার বাঙলায় অপরিবর্তিত থাকে।

আবার, সংস্কৃত০ ষণ্ড, ভণ্ড > বাঙলা০ ষাঁড়, ভাঁড়।

এই পুনঃব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে সূত্র হবে : সংস্কৃত ড-কারের সঙ্গে সংযুক্ত ব্যঞ্জন-ধ্বনিটি আনুনাসিক হ'য়ে অব্যবহিত পূর্বের স্বরধ্বনিটির সঙ্গে মিলিত হ'লে এবং ঐ স্বরধ্বনিকে দীর্ঘায়িত করলে সংস্কৃত ড-কার বাঙলায় ড়-কারে পরিণত হয়।

কাজেই, ভাষায় ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা সাধিত কোন পরিবর্তন সমগ্র ভাষা-সম্প্রদায়ে একই রূপে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হ'লে তা নিয়মিত পরিবর্তনে পরিণত হয়। ব্যাপক পরিবর্তনের এই রীতিকে **ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়ম** (Phonetic Law) বলা হয়।

Tucker বলেছেন : A phonetic law of a language is a statement of the regular practice of that language at a particular time in regard to the treatment of a particular sound or group of sounds in a particular setting.

এই সংজ্ঞানুযায়ী বোঝা যায় : ধ্বনিগত পরিবর্তনকে নিয়মিত হ'তে হবে এবং তা সর্বকালীন নয়, নির্দিষ্ট কালের জন্যে নির্দিষ্ট ভাষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ধ্বনির বিশেষ অবস্থান ধ্বনি-পরিবর্তন সূত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ধ্বনি-পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া

বিভিন্ন ভাষায় ধ্বনি-পরিবর্তনে নানা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। কোথাও ধ্বনি পরিবর্তিত হয়, কোথাও বিলুপ্ত হয়, কোথাও আবার ধ্বনির ঘটে আগমন। এই বৈচিত্র্যের মূলে শব্দ, ধ্বনি ও অর্থের প্রভাব থাকলেও বাগ্‌যন্ত্রের ত্রুটি, চিন্তা ও বাগ্‌বিন্যাসে সৌষম্য সৃষ্টির প্রয়াস, অজ্ঞতা ইত্যাদিরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। বৈচিত্র্যের দলেই ধ্বনি-পরিবর্তনে বিভিন্ন প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, এদের মধ্যে বর্ণবিপর্যয়, স্বরাগম, অপিনিহিতি, স্বরভক্তি, সমাক্ষরলোপ, সমীভবন ও বিষমীভবন উল্লেখযোগ্য।

১. **বর্ণবিপর্যয় বা বিপর্যাস** (Metathesis)

পদমধ্যস্থিত সন্নিহিত দু'টি ব্যঞ্জনধ্বনির পারস্পরিক অবস্থান পরিবর্তনকে বলে 'বর্ণবিপর্যয়'। যেমন, আরবী০ কুফ্‌ল্ > বাঙলা০ কুলুপ ; সংস্কৃত০ বারাণসী >

ইংরেজী° Benaras ; আবেস্তা° বফ্র> ফারসী বর্‌ফ্‌ ; পিশাচ> পিচাশ ; Box> বাস্‌ক ; Ricksaw> রিস্‌কা ; সংস্কৃত° কৃষ্ণ> প্রাকৃত° কান্‌হ ; হ্রদ> দহ ; তলোয়ার> তরোয়াল।

২. স্বরাগম (Prothesis)

পদের আদিতে যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে উচ্চারণের অসুবিধা দূর করার জন্যে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে তাকে বলা হয় 'স্বরাগম' বা 'আদিস্বরাগম'। এই স্বরাগমের প্রভাবেই station, stupid, stable, school, steamer, screw প্রভৃতি শব্দগুলি বাঙলায় সাধারণ মানুষের উচ্চারণে যথাক্রমে ইসটেশন, ইসটুপিড, আস্তাবল, ইসকুল, ইসটীমার ও ইসক্রু হয়েছে। লাতিন schola ও spatulla শব্দ দুটি ফরাসীতে হয়েছে e'cole (স্কুল) ও e'paule (কাঁধ)। Plato আরবীতে হয়েছে আফলাতুন। 'স্পর্ধা'> 'আস্পর্ধা'।

পদের আদিতে যুক্ত ব্যঞ্জন না থাকলেও অনেক সময় স্বরাগম ঘটতে দেখা যায়। যেমন, কুমারী> অকুমারী ; মন্দ> অমন্দ।

শব্দের শেষে স্বরধ্বনি যুক্ত হ'লে তাকে 'অন্ত্যস্বরাগম' (Apothesis) বলা হয়। যেমন, সংস্কৃত° দিশ্‌> দিশা ; Bench> বেঞ্চি ; ফারসী° দের> দেরি।

শব্দের মধ্যে স্বরধ্বনির প্রবেশকে বলে 'মধ্যস্বরাগম'। সেদিক থেকে 'স্বরভক্তি'র সংগে এর তফাৎ খুব সামান্যই। বাঙলা কাব্যে ও সাধারণ মানুষের উচ্চারণে এর দৃষ্টান্ত মেলে। যেমন, ভক্তি> ভকতি ; শক্তি> শকতি ; মুক্তা> মুকুতা ; Glass> গেলাস ; ফারসী° দর্দ> দরদ।

৩. অপিনিহিতি (Epenthesis)

পরবর্তী স্বর বা অর্ধ-স্বরধ্বনির অনুরূপ স্বরধ্বনি, উচ্চারণকে সহজ করার জন্যে, শব্দের মধ্যে প্রবেশ করলে তাকে 'অপিনিহিতি' বলে। যেমন, সাধু> সাউধ ; গাঁতি> গাঁইতি। আঞ্চলিক উচ্চারণে উদাহরণ পাওয়া যায় : করিয়া> কইরা ; ধরিয়া> ধইরা ; ভরিয়া> ভইরা ; জন্য> জইন্ন ; বাক্য> বাইক্ক ইত্যাদি। অপিনিহিতির সুপ্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রীক, প্রাচীন ইংরেজী, বিশেষ ক'রে আবেস্তা ভাষায় ('epenthesis is one of the characteristic

২—

sound phenomena of the Avesta'—জ্যাকসন)। যেমন, সংস্কৃত° ভ্রবতি> আবেস্তা° ববইতি।

৪. স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ (Anaptyxis)

দু'টি সন্নিহিত ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে স্বরের আগমনকে বলে 'স্বরভক্তি'। 'র' ব্যঞ্জন-ধ্বনিটির সঙ্গে যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রেই স্বরভক্তির বিশেষ প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, স্পর্শ>পরশ ; বর্ষা>বরষা ; মনোহর্থ>মনোরথ ; প্রীতি>পিরীতি ; স্কুপ>ইসকুরূপ ; স্ত্রী>ইসতিরি।

৫. সমাক্ষর লোপ (Haplology)

পাশাপাশি অবস্থিত দু'টি সমধ্বনিবিশিষ্ট অক্ষরের একটি লুপ্ত হওয়ার নাম 'সমাক্ষর লোপ'। যেমন, নক্‌ক্ষত্র>নক্ষত্র ; ধ্রুবপদ>ধ্রুপদ ; পাদোদক> পাদোক ; ভাইশ্বশুর>ভাশুর; God-spel>Gospel ; তৎক্ষণ>তখন ; মজদুর> মজুর ; অনেকক্ষণ>অনেক্ষণ ; দাদা>দা (বড়দা, ঠাকুরদা, ইত্যাদি) ; দিদি>দি (বড়দি, মেজদি, ছোড়দি, বউদি) ; মুদ্গর>মুগুর ; সপত্নী>সতীন। 'জোড়-কলম শব্দে' সমাক্ষর লোপের উদাহরণ পাওয়া যায়—Camel+Leopard= Cameleopard ; Potato+Tomato=Pomato ; Cinema+Matine'e= Cinematine'e ইত্যাদি। এর অনুকরণে সুকুমার রায়ের হাঁস+সজারু= হাঁসজারু ; হাতি+তিমি=হাতিমি ; সিংহ+হরিণ=সিংহরিণ ইত্যাদি কৌতুকী প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য।

৬. সমীভবন (Assimilation)

উচ্চারণের সময় পদস্থিত দু'টি ধ্বনি পারস্পরিক প্রভাবে অল্পবিস্তর পরিবর্তিত হ'লে ঐ পরিবর্তনকে বলে 'সমীভবন'। সংস্কৃতে সন্ধি ও সংস্কৃত শব্দের প্রাকৃতে পরিবর্তন—এই দু'টি ক্ষেত্রে সমীভবনের প্রচুর উদাহরণ পরিলক্ষিত হয়। সমীভবন তিন রকম—

প্রগত (Progressive) : পূর্ববর্তী ধ্বনি দ্বারা পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তনকে বলে 'প্রগত সমীভবন'। যেমন, পদ্ম>পদ্দ ; পক্ব>পক্ক ; বোলতা>বল্লা।

পরাগত (Regressive) : পরবর্তী ধ্বনি দ্বারা পূর্ববর্তী ধ্বনির পরিবর্তনকে বলে 'পরাগত সমীভবন'। যেমন, তৎ+জন্য=তজ্জন্য ; উৎ+মুখ=উন্মুখ ;

কর্ম > কম্ম ; ধর্ম > ধম্ম ; র্ঁাধ্ + না > রান্না ; গল্প > গপ্‌পো ; কাঁদ + না > কান্না ; ইন্দো-ইউরোপীয়° Penque > লাতিন° Quinque.

পারস্পরিক (Mutual) : পরস্পরের প্রভাবে দু'টি ধ্বনিরই পরিবর্তনকে বলে 'পারস্পরিক' বা 'অন্যোন্য সমীভবন'। যেমন, উৎ + শ্বাস > উচ্ছ্বাস ; সংস্কৃত° সত্য, মধ্য > প্রাকৃত° সচ্চ, মজ্‌ঝ ; উৎ + শৃঙ্খল > উচ্ছৃঙ্খল।

৭. বিষমীভবন (Dissimilation)

পদস্থিত দু'টি সমধ্বনির একটি পরিবর্তিত হলে 'বিষমীভবন' হয়। যেমন, শরীর > শরীল ; মুরারি > মুরালী ; লূণ > নুন ; লাল > নাল ; পরতুগীজ° Armario > আলমারি ; লাতিন° Marmor, Turtur > ইংরেজী° Marble, Turtle ; সংস্কৃত° পিপীলিকা > পালি° কিপিল্লিকা।

ধ্বনি-পরিবর্তনের আরো কয়েকটি প্রক্রিয়া এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে :

৮. ক্ষতিপূরণ দীর্ঘীভবন (Compensatory Lengthening)

কোন শব্দের মধ্যবর্তী বা অন্তঃস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে যদি লুপ্ত ধ্বনির ক্ষতিপূরণস্বরূপ পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয় তবে তাকে বলে 'ক্ষতিপূরণ দীর্ঘীভবন' বা 'পূরণস্বরূপ দীর্ঘীকরণ'। এর ফলেই সংস্কৃত 'কর্ম, সর্প, চন্দ্র, লম্ফ, ভক্ত, মৎস্য, পঞ্চ, পশ্চাৎ, সন্ধ্যা' ইত্যাদি শব্দগুলি প্রাকৃতে 'কম্ম, সপ্প, চন্দ, লম্ফ, ভত্ত, মচ্ছ, পঞ্চ, পাচ্ছ, সঞ্‌ঝা' হয়ে বাঙলায় রূপান্তরিত হয়েছে যথাক্রমে এইরূপে 'কাম, সাপ, চাঁদ, লাফ, ভাত, মাছ, পাঁচ, পাছ, সাঁঝ'।

৯. ব্যঞ্জনাগম

শব্দের মধ্যে ব্যঞ্জনধ্বনির আগমনকে বলে 'ব্যঞ্জনাগম'। যেমন, বৈদিক° সুনর > সুন্দর ; সংস্কৃত° বানর > বান্দর > বাঁদর।

শব্দের আদিতেও ব্যঞ্জনাগম লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ওঝা > রোজা ; উজু > রুজু।

১০. অভিশ্রুতি (Umlaut)

অপিনিহিত স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলিত হ'য়ে যদি পরবর্তী স্বরধ্বনিকে বিকৃত করে তবে তাকে 'অভিশ্রুতি' বলা হয়। যেমন, "করিয়া" শব্দটির 'অপিনিহিতি' "কইরা" থেকে "ক'রে"। এভাবে—বলিয়া > বইলা >

ব'লে ; মরিয়া > মইরা > ম'রে ; মারিয়া > মাইরা > মেরে ; আজি > আইজ > আজ ; কালি > কাইল > কাল ; রাতি > রাইত > রাত ; মাঠুয়া > মাউঠা > মেঠো ; জলুয়া > জউলা > জোলো।

১১. অপশ্রুতি (Ablaut)

শব্দের মধ্যে ধাতুর মূল স্বরধ্বনির বিকৃতিকে বলে 'অপশ্রুতি'। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহে অনেক ধ্বনি-পরিবর্তন এই অপশ্রুতির ফল। এজন্যেই ইন্দো-ইউরোপীয় স্বরধ্বনির ব্যবহারে গুণিত, বর্ধিত ও ক্ষয়িত—এই তিনটি ক্রম লক্ষ্য করা যায়। যেমন, গ্রীক° মেনো (গুণিত) > সংস্কৃত° মান (বর্ধিত) > আবেস্তা° -ম্ন (ক্ষয়িত)। সংস্কৃত ভাষায় এর উদাহরণ প্রচুর। যেমন, 'কৃ' ধাতু-নিষ্পন্ন 'কৃত, করোতি, কারয়তি' শব্দ তিনটিতে একইরূপ স্বরক্রম লক্ষ্য করা যায়। বাঙলায় √চল্ > চাল, √পড়্ > পাড়্ ইত্যাদি অপশ্রুতিরই ফল।

১২. স্বরসংগতি (Vowel Harmony)

অপিনিহিতি বা বিপর্যাস বা সন্ধি ছাড়াই অভিশ্রুতির মতো ধ্বনি-পরিবর্তনকে বলে 'স্বরসংগতি'। এখানে স্বরধ্বনির পরিবর্তনে অন্য স্বরধ্বনির প্রভাব থাকে এবং উঁচু স্বরের প্রভাবে নীচু স্বর উঁচু হয়। স্বরসংগতি তিন রকম :

প্রগত : আদিস্বরের প্রভাবে অন্ত্যস্বরের পরিবর্তন। যেমন, হুঁকা > হুঁকো ; রূপা > রূপো ; তুলা > তুলো ; চিড়া > চিড়ে ; পিঁপড়া > পিঁপড়ে।

পরাগত : অন্ত্যস্বরের প্রভাবে আদিস্বরের পরিবর্তন। যেমন, দেশী > দিশী।

মধ্যগত : আদি বা অন্ত্যস্বরের প্রভাবে মধ্যস্বরের পরিবর্তন। যেমন, বিলাতি > বিলিতি ; বারেন্দা > বারান্দা ; নিরাবিলে > নিরিবিলি ; পরতুগীজ° Janela > জানালা ; কুড়াল > কুড়ুল।

১৩. স্বরধ্বনি লোপ

পদস্থিত কোন অক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাত থাকলে শ্বাসাঘাতহীন অক্ষরে স্বরধ্বনি যদি ক্ষীণ হ'য়ে এসে লোপ পায় তবে তাকে বলে 'স্বরধ্বনি লোপ'। এরূপ ধ্বনি-পরিবর্তন ঘটে তিন রকমে :

আদিস্বর লোপ (Aphesis) : শব্দের আদিস্থিত স্বরধ্বনির বিলোপ। যেমন, অলাবু > লাউ ; অভ্যন্তর > ভেতর ; এরণ্ড > রেড়ী ; উদ্ধার > ধার।

মধ্যস্বর লোপ (Syncope) : শব্দের মধ্যস্থিত স্বরধ্বনির বিলোপ। যেমন, সুবর্ণ>স্বর্ণ; গৃহিণী>গিন্নী; গামোছা>গামছা; পরিষদ্>পর্ষদ্; পৃথিবী>পৃথী; দারুচিনি>দারচিনি; দেওয়াল>দেয়াল; রওয়ানা>রওনা; জানালা>জানলা; দরওয়াজা>দরজা।

অন্ত্যস্বর লোপ (Apocope) : শব্দের অন্তঃস্থিত স্বরধ্বনির বিলোপ। যেমন, অগ্নি>আগুন; সন্ধ্যা>সাঁঝ; তন্ত্রী>তাঁত; ব্যাঘ্র>বাঘ; সবচেয়ে>সবচে'; শ্রেষ্ঠী>শেঠ; বৃদ্ধি>বাড়; অংশু>আঁশ; দেবদারু>দেওদার; দদ্রু>দাদ; শিরা>শির; পাতা>পাত।

১৪ নাসিক্যীভবন (Nasalization)

নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি লুপ্ত হ'য়ে যদি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে আনুনাসিক করে তবে তাকে নাসিক্যীভবন বলে। যেমন, সন্ধ্যা>সাঁঝ; চন্দ্র>চাঁদ; পঞ্চ>পাঁচ; হংস>হাঁস; বন্ধ>বাঁধ; বন্ধু>বঁধু; সংক্রম>সাঁকো; গ্রাম>গাঁ; মাংস>মাঁস।

অনেক সময় নাসিক্য ব্যঞ্জনের সাহচর্য ছাড়াই স্বরধ্বনি আনুনাসিক হয়, তাকে বলে 'স্বতোনাসিক্যীভবন' (Spontaneous Nasalization)। যেমন, পুথি>পুঁথি; টেকসই>টেঁকসই; অস্থি>আঁধি; হাটু>হাঁটু; ইট>ইঁট।

১৫. মূর্ধণ্যীভবন (Cerebralization)

মূর্ধা-ধ্বনি ঋ, র ও ষ-এর প্রভাবে দন্ত্য ব্যঞ্জনের মূর্ধণ্য উচ্চারণের নাম 'মূর্ধণ্যীভবন'। যেমন, বর্ধ>বড্ঢ>বাড়; অস্থি>অট্ঠি>আঁঠি; বৃন্ত>বেণ্ট>বোঁটা; কৃন্তক>কণ্টক>কাঁটা।

অনেক সময় ঋ, র, ষ প্রভৃতি মূর্ধা-ধ্বনির সাহচর্য ছাড়াই দন্ত্য ব্যঞ্জন মূর্ধণ্য উচ্চারিত হয়, তাকে বলে 'স্বতোমূর্ধণ্যীভবন' (Spontaneous Cerebralization)। যেমন, উৎ+দীন>উড্ডীন; বৈদিক° চততি>প্রাকৃত° চড়ই>বাঙলা° চড়ে; সংস্কৃত° পততি>প্রাকৃত° পডই>বাঙলা° পড়ে।

১৬. উষ্মীভবন (Spirantization)

স্পৃষ্টধ্বনি উচ্চারণকালে যদি শ্বাস মুখগহ্বর হ'তে একবারে না-বেরিয়ে কিছুক্ষণ ধ'রে বেরোয় তবে ধ্বনিটির উচ্চারণ উষ্ম হয়। একেই 'উষ্মীভবন'

বলে। বাঙলা ভাষার কোন-কোন আঞ্চলিকরূপে এর উদাহরণ পাওয়া যায়, যেখানে 'কাজের পাগল'কে বলা হয় 'খাজের ফাগল'। এমনিতে 'প্রফুল্ল' শব্দটির 'ফ' উষ্মীভূত।

১৭. স-কারীভবন (Assibilation)

উষ্মধ্বনির স, শা, জ হওয়ার নাম 'স-কারীভবন'। যেমন, মেজদা> মেজ্দা ; পাঁচসের>পাঁশ্শের ; পাদ+তলা>পাছতলা>পাস্তলা।

১৮. র-কারীভবন (Rhofacism)

স-কারের র-কারে পরিণত হওয়ার নাম 'র-কারীভবন'। যেমন, প্রাচীন লাতিন° Ausoza>Auzoza>Amora ; প্রাচীন ইংরেজী° Hasa>Haza>Hare.

কখনো-কখনো 'দ' মূর্ধণ্যীভূত 'ড' থেকে 'ড়' হয়ে 'র' বা 'ল' হয়, একেও 'র-কারীভবন' বলা হয়। যেমন, সংস্কৃত° দ্বাদশ>ড্বাডশ>বাডস> বাড়হ>বার ; সংস্কৃত° পঞ্চদশ>প্রাকৃত° পনডহ>বাঙলা° পনর ; ষট্+দশ> ষোড়শ>ষোল ; সংস্কৃত° কটকৃত্য>বাঙলা° কড়চা।

১৯. ঘোষীভবন (Vocalization)

অঘোষধ্বনির ঘোষধ্বনিতে পরিবর্তিত হওয়াকে বলে 'ঘোষীভবন'। যেমন, ছাত>ছাদ ; যতদূর>যদ্দূর ; আঞ্চলিক ভাষায় কাক, বক, শাক>কাগ, বগ, শাগ ; সংস্কৃত° তাত>দাদা।

ঘোষীভবনের বিপরীত ব্যাপার 'অঘোষীভবন' (Devocalization), সেখানে ঘোষধ্বনি অঘোষধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন, মদ্+ত>মত্ত ; জর্মন° Weib>ইংরেজী° Wife.

২০. ধ্বনিদ্বিত্ব

শ্বাসাঘাতের প্রাধান্যে অথবা বক্তা জোর দিয়ে শব্দ উচ্চারণ করলে অনেক সময় ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হয়, একেই 'ধ্বনিদ্বিত্ব' বলা হয়। যেমন, তখনই>তখ্খনি ; একেবার>এক্কেবারে ; সকালবেলা>সক্কালবেলা ; ঢাকা>Dacca.

২১. মহাপ্রাণতা (Aspiration)

অল্পপ্রাণ (বর্গের ১ম ও ২য় বর্ণ) মহাপ্রাণে (বর্গের ২য় ও ৪র্থ বর্ণ)

পরিণত হ'লে বলে 'মহাপ্রাণতা'। যেমন, সংস্কৃত° অত্র > প্রাকৃত° এথ > বাঙলা° হেথা ; সংস্কৃত° গৃহ, গৃহিণী > বাঙলা° ঘর, ঘরণী।

মহাপ্রাণ অল্পপ্রাণে পরিণত হ'লে বলে অল্পপ্রাণতা (Deaspiration)। যেমন, অবধি > অব্‌দি ; শীঘ্র > শীগ্র ; সংস্কৃতে √ধা—ধধাতি > দধাতি ; √ভূ—ভভার > বভার।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধ্বনি-পরিবর্তন সূত্র

ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষার স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনিসমূহের যে পরিবর্তন জর্মনিক শাখায় ঘটেছিলো সেই পরিবর্তনের নিয়ম জাকব গ্রিম তাঁর Grammatik গ্রন্থে (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮২২) প্রথম সূত্রাকারে উপস্থাপিত করেন। তাঁর আগেই অবশ্য রাসমুস রাস্ক এই ধ্বনি-পরিবর্তন প্রক্রিয়া লক্ষ্য করেছিলেন এবং Undersogelse (প্রথম প্রকাশ ১৮১৮) গ্রন্থে সে-ইংগিতও দিয়েছিলেন। কিন্তু সূত্রাকারে প্রদর্শনের কৃতিত্ব গ্রিমেরই প্রথম।

১. গ্রিমের সূত্র (Grimm's Law)

গ্রিমের সূত্রটি নিম্নরূপ ঃ

মূলভাষার বর্গের চতুর্থ, তৃতীয় ও প্রথম ধ্বনি জর্মনিক শাখায় যথাক্রমে বর্গের তৃতীয়, প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন,

ক. বর্গের চতুর্থ ধ্বনি > বর্গের তৃতীয় ধ্বনি

মূলভাষা° Ghonso (সংস্কৃত° হংস) > ইংরেজী° Goose

মূলভাষা° Bhrater (সংস্কৃত° ভ্রাতা) > ইংরেজী° Brother

এখানে Gh (ঘ) > G (গ) এবং Bh (ভ) > B (ব) হয়েছে।

খ. বর্গের তৃতীয় ধ্বনি > বর্গের প্রথম ধ্বনি

মূলভাষা° Dont (সংস্কৃত° দন্ত) > ইংরেজী° Tooth

মূলভাষা° Dekan > ইংরেজী° Ten

এখানে D(ড) > T (ট) হয়েছে।

গ. বর্গের প্রথম ধ্বনি > বর্গের দ্বিতীয় ধ্বনি

মূলভাষা° Peku—গথিক° Faihu > ইংরেজী° Fee

মূলভাষা° Pater (সংস্কৃত° পিতা)>ইংরেজী° Father

এখানে (প)>F (দ) হয়েছে।

গ্রিমের তীয় ধ্বনি-পরিবর্তন সূত্র এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি জর্মনিক ভাষায় ৫ 'টি ধ্বনি-পরিবর্তন দেখিয়েছেন তা ক্রমপরিণতিতেই উদ্ভূত এবং তাদের মধ্যে কয়েক শতাব্দীর ব্যবধান—প্রথম পরিবর্তনটি ঘটে খৃস্টপূর্বাব্দে, দ্বিতীয় পরিবর্তনটি ঘটে অষ্টম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে।

প্রথম ধ্বনি-পরিবর্তনের ফলে ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা থেকে জর্মনিক শাখার ব্যঞ্জনধ্বনি পদ্ধতিতে ভিন্নতা সূচিত হয় এবং দ্বিতীয় ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে জর্মনিক শাখা দ্বিধাবিভক্ত হয়—উচ্চ জর্মন উপভাষাগুলি নিম্ন জর্মন উপভাষা থেকে আলাদা হ'য়ে পড়ে।

গ্রিমের দ্বিতীয় ধ্বনি-পরিবর্তন সূত্রকে এভাবে বর্ণনা করা যায় :

মূলভাষার বর্গের চতুর্থ, তৃতীয় ও প্রথম ধ্বনি জর্মনিক শাখায় যথাক্রমে বর্গের তৃতীয়, প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনিতে পরিণত হ'য়ে পরবর্তী কালে উচ্চ জর্মন উপভাষায় যথাক্রমে বর্গের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন,

সংস্কৃত°-গ্রীক° ত্রি>ইংরেজী° থ্রী>জর্মন° দ্রাই (ত—থ—দ)

সংস্কৃত° গ্রীক° তনু>ইংরেজী° থিন>জর্মন° দুঃন (ত—থ—দ)

গ্রিম-প্রদর্শিত ধ্বনি-পরিবর্তন সূত্র দু'টি এভাবেও বর্ণিত হয় :

মূল ভাষা ও সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন		গ্রিমের প্রথম সূত্র : গথিক ও নিম্ন জর্মনে		গ্রিমের দ্বিতীয় সূত্র : উচ্চ জর্মনে
ঘ, ধ, ভ	→	গ, দ, ব	→	ক, ত, প
(চতুর্থ ধ্বনি)		(তৃতীয় ধ্বনি)		(প্রথম ধ্বনি)
গ, দ, ব	→	ক, ত, প	→	খ, থ, ফ
(তৃতীয় ধ্বনি)		(প্রথম ধ্বনি)		(দ্বিতীয় ধ্বনি)
ক, ত, প	→	খ, থ, ফ	→	গ, দ, ব
(প্রথম ধ্বনি)		(দ্বিতীয় ধ্বনি)		(তৃতীয় ধ্বনি)

২. গ্রাসম্যানের সূত্র (W. Grassmann's Law)

মূলভাষার স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনিসমূহের জর্মনিক শাখায় পরিবর্তন-সূত্র গ্রিম

ব্যাখ্যা করলেও পরবর্তীকালে তাতে বিস্তর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। এই ব্যতিক্রমের সূত্র-প্রণেতাদের অন্যতম গ্রাসমান। তাঁর নির্দেশিত সূত্র এই :

মূলভাষার কোন পদে পাশাপাশি দু'টি অক্ষরে মহাপ্রাণ ধ্বনি থাকলে তার একটি (প্রায়ক্ষেত্রে প্রথমটি) গ্রীক ও আর্য-শাখায় অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।

যেমন, মূলভাষা° Dhugter>সংস্কৃত° দুহিতা (ইংরেজী° Daughter)
মূলভাষা° Bhendh>সংস্কৃত° বন্দ (ইংরেজী° Bind)

এখানে মূলভাষার 'ধ' ও 'ভ' ধ্বনি দু'টি আর্য-শাখায় যথাক্রমে 'দ' ও 'ব' এবং গ্রীক-শাখায় **'D'** ও **'B'** ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। মূলভাষার Bhendh শব্দটির দু'টি মহাপ্রাণ ধ্বনিই (Bh ও Dh) ইংরেজীতে অল্পপ্রাণ (B ও D) হয়েছে।

৩. **বেরনেরের সূত্র** (K. Verner's Law)

গ্রাসমান ব্যতিক্রমের সূত্র নির্দেশ করেছিলেন ১৮৬২ খৃস্টাব্দে। ১৮৭৬ খৃস্টাব্দে বেরনের ব্যতিক্রম-সংক্রান্ত আরেকটি সূত্র বর্ণনা করেন। ফলে গ্রিমের সূত্রের পরিপূরক হিসেবে এই দু'জন পণ্ডিতের অবদান অনস্বীকার্য হ'য়ে ওঠে। বেরনেরের সূত্রে স্বরাঘাতের (Accent) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাঁর সূত্রটি নিম্নরূপ :

মূলভাষায় পদটি যদি একাক্ষর না হয় এবং ব্যঞ্জনটির অব্যবহিত পূর্ববর্তী অক্ষরে যদি স্বরাঘাত না থাকে তবে বর্গের প্রথম ধ্বনি ও 'স' জর্মনিক শাখায় যথাক্রমে বর্গের তৃতীয় ধ্বনিতে ও জ-কারে পরিণত হয়।

গ্রিমের সূত্রানুযায়ী আমরা দেখেছি পূর্ববর্তী অক্ষরে স্বরাঘাত থাকার জন্যে মূলভাষার 'ক, ত, প' (প্রথম ধ্বনি) নিম্ন জর্মনে 'খ, থ, ফ' (দ্বিতীয় ধ্বনি)-তে পরিণত হয়। বেরনের দেখালেন স্বরাঘাতের অভাবে মূলভাষার 'ক, ত, প' (প্রথম ধ্বনি) গ্রিমের সূত্রে ব্যতিক্রম এনে 'গ, দ, ব' (তৃতীয় ধ্বনি)-তে রূপান্তরিত হয়েছে।

যেমন, মূলভাষা° Klut'os (সংস্কৃত° শ্রুতস্)>প্রাচীন ইংরেজী° Llud> ইংরেজী° Loud

মূলভাষা° Kmt'om>গথিক° Hund>ইংরেজী° Hundred

মূলভাষা° Kas'a (সংস্কৃত° শশ)>Haza (>ইংরেজী° Hare)

এখানে 'Klutos' ও 'Kmtom' শব্দ দুইটির পূর্ববর্তী অক্ষর K(ক)-তে স্বরাঘাত নেই, স্বরাঘাত রয়েছে পরবর্তী অক্ষর T(ট)-তে, ফলে ট>ড হয়েছে। 'Kasa' শব্দটিতেও পরবর্তী অক্ষরে 'S' (স)-তে স্বরাঘাত, ফলে স>জ হয়েছে।

৪. কোলিৎসের সূত্র (H. Collitz' Law)

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার জর্মনিক শাখায় ধ্বনি-পরিবর্তন সূত্র নির্ধারণ করেছিলেন জাকব গ্রিম, কোলিৎস করেছিলেন ইন্দো-ইরানীয় বা আর্য-শাখায় ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়ম আবিষ্কার। তাঁর সূত্রটি এই :

মূলভাষার কণ্ঠ্য ও কণ্ঠৌষ্ঠ্য ধ্বনি যদি হ্রস্ব ও দীর্ঘ 'ই' 'ঈ' ও 'এ'—এই তিনটি তালব্য স্বরধ্বনির অব্যবহিত পূর্বে থাকে তবে তা আর্য-শাখার তালব্য ধ্বনিতে (চ-বর্গে) পরিণত হয়।

যেমন, মূলভাষা° Lenqes>সংস্কৃত° রোচ। মূলভাষা° Qwe>সংস্কৃত° চ, প্রাচীন পারসী° চা। মূলভাষা° Gwiwos>সংস্কৃত° জীবস্, প্রাচীন পারসী° জীব।

৫. অ্যাসকলির সূত্র (Ascoli's Law)

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখাগুলির তুলনামূলক আলোচনা ক'রে ১৮৭০ খৃস্টাব্দে অ্যাসকলি প্রমাণ করলেন যে :

মূলভাষার তালব্যধ্বনি কতকগুলি শাখায় কণ্ঠ্যধ্বনির সাথে মিশেছে এবং অন্যান্য শাখায় উষ্মধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।

মূলভাষার Kmtom শব্দটি লাতিনে হয়েছে Centum, কিন্তু ফারসী-সংস্কৃতে হয়েছে Satam—এ থেকেই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহের দু'ধারায় পরিবর্তন ঘটেছে, এবং ধারা দু'টির নামও দেয়া হয়েছে 'কেনতুম' ও 'শতম্'। গ্রীক, লাতিন, জর্মন, কেলটিক প্রভৃতি 'কেনতুম' শাখান্তর্গত ; ইন্দো-ইরানীয়, বালটো-স্লাভিক প্রভৃতি 'শতম্' শাখান্তর্গত। দৃষ্টান্ত :

কেনতুম=গ্রীক° দেকা, লাতিন° দেকেম, গথিক° তইখুন।

শতম্=সংস্কৃত° দশম্, আবেস্তা° দশম্, লিথুয়ানীয়° দেশিম্‌ত্।

সাদৃশ্যমূলক পরিবর্তন

ধ্বনি-পরিবর্তনের স্বাভাবিক ও সংগত নিয়ম এড়িয়ে ভাষায় অনেক শব্দই স্থান করে নেয়। এই ব্যতিক্রমের কারণ খুঁজতে গিয়ে ভাষাতাত্ত্বিকগণ যে ক'টি বিশেষ ধরনের পরিবর্তনের কথা বলেছেন, তাদের একটি সাদৃশ্যমূলক পরিবর্তন (Analogical Change)। এই পরিবর্তনের মূলে রয়েছে ভিন্নাকার শব্দের প্রভাব। 'একাধিক ভিন্নাকার শব্দ যদি অন্য শব্দের আকার পায় তবে সেই ব্যাপারকে বলে সাদৃশ্য' (Analogy)।

ধ্বনি-পরিবর্তনের অন্যতম প্রক্রিয়া 'ক্ষতিপূরণ দীর্ঘীভবন'-এর সূত্রানুসারে 'সর্প—সপ্প—সাপ' হয়, কিন্তু 'সর্ব—সব্ব—সাব' না হ'য়ে 'সর্ব—সব্ব—সব' হয়েছে। এই ব্যতিক্রমের কারণ: 'সব' শব্দনির্মাণে বহুবচনাত্মক 'সভা' শব্দটির সাদৃশ্যগত প্রভাব।

ভাষার অস্তিত্ব মানুষের মনে, সেই খেয়ালী মনের খেলায় নিয়মের মাঝে আসে অনিয়ম। ফলে ধ্বনি-পরিবর্তনের সূত্র সর্বদাই অংকে মেলে না। মানুষের বোধে যে সাম্য সংগুপ্ত কিন্তু সক্রিয় তা-ই সামাজিক জীবনের অনেক কিছুর মতো ভাষার ভিন্নাকার উপাদানকেও এক ছাঁচে ঢালার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। তারপর মানুষের শৃংখলাবোধ চায় তার শব্দভাণ্ডারকে অর্থময়তার দিক দিয়ে শ্রেণীবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত করতে। এ-সব মনস্তাত্ত্বিক কারণেই ঘটে সাদৃশ্যমূলক পরিবর্তন।

কাজেই, অর্থময় শব্দ বা পদসমষ্টির সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে শব্দের বা পদের ধ্বনি বা অর্থ-পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলে সাদৃশ্য। আর সাদৃশ্য হচ্ছে, গোল্ডবের্গ বলেছেন, (Analogy) is a kind of economy, a kind of equilibrium.

সাদৃশ্যের ফলে পরিবর্তন ঘটে তিন রকম: ১. নতুন শব্দ বা পদ গঠন; ২. নতুন শব্দের বা পদের আকার পরিবর্তন; ৩. পুরোনো পদের অর্থ পরিবর্তন।

নতুন শব্দ বা পদ গঠন

'নাপিতানী' 'ধোপানী' ইত্যাদি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ, যা পেশাগত পরিচয় প্রকাশ করে, এদের সাদৃশ্যে সৃষ্টি হয়েছে 'মজুরনী', 'মাষ্টারনী', 'ডাক্তারনী', ইত্যাদি শব্দ।

সংস্কৃত 'দেবতা' 'বন্ধুতা' ইত্যাদি শব্দের '-তা' প্রত্যয় 'ভাব' অর্থবোধক, বাঙলায় এ-সব শব্দের সাদৃশ্যে 'সম-ভাব' অর্থে 'সমতা' শব্দের সৃষ্টি।

সংস্কৃত 'বধূটি' শব্দ থেকে 'বউড়ী' শব্দের উৎপত্তি, এর সাদৃশ্যে 'শাশুড়ী' ও 'ঝিউড়ী' শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। 'দ্বাদশ' শব্দের সাদৃশ্যে 'একদশ' শব্দটি 'একাদশ' হয়েছে।

নতুন শব্দের বা পদের আকার পরিবর্তন

প্রাচীন বাঙলায় 'আমার' ও 'তোমার' অর্থবোধক 'আহ্মার' ও 'তোহ্মার' শব্দ দু'টির সাদৃশ্যে 'সবার' হয়েছে 'সহ্মার'।

পুরোনো পদের অর্থ পরিবর্তন

বৈদিক 'রোদসী' শব্দের সাদৃশ্যে রবীন্দ্রনাথ 'ক্রন্দসী' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'ক্রন্দসী' শব্দটি ঋক্‌সংহিতায় (২-১২-৮) আছে, কিন্তু সেখানে তার অর্থ চীৎকার-কারী বিপক্ষ সেনাদ্বয়'।

সাদৃশ্যের এই ত্রিবিধ কার্যক্রমের মধ্যে প্রধান পদ্ধতি হচ্ছে: বিমিশ্রণ, জোড়-কলম শব্দ, সঙ্কর শব্দ, লোকনিরুক্তি, বিশ্লচ্ছেদ ও ভুয়া শব্দ।

বিমিশ্রণ (Contamination)

একটি মাত্র শব্দের প্রভাবে অপর কোন শব্দের রূপ-পরিবর্তনকে বলে 'বিমিশ্রন'। যেমন,

'রস' শব্দের প্রভাবে পরতুগীজ° Annanas > বাঙলা° আনারস। 'তড়িৎ' শব্দের সাদৃশ্যে রবীন্দ্রনাথের 'ঝটিৎ' শব্দের প্রয়োগ। 'কালিদাস'-এর আদলে ভুল বানান 'চণ্ডিদাস'। Will/Shall-এর প্রভাবে can থেকে could.

জোড়কলম শব্দ (Portmanteau Word)

দু'টি শব্দের যোগবিয়োগে উৎপন্ন নতুন শব্দকে বলে 'জোড়কলম শব্দ'। যেমন,

আরবী° মিন্নৎ + সংস্কৃত° বিজ্ঞপ্তি > বাঙলা° মিনতি ; পয়োধর + ভার > পয়োভার ; নিশ্চল + চুপ > নিশ্চুপ ; পৃথু + স্থূল > পৃথুল ; উন্মুখ + মুখর > উন্মুখর ; ধোঁয়া + কুয়াশা > ধোঁয়াশা ; slip + glide > slide.

সঙ্কর শব্দ (Hybrid word)

বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন শব্দ ও শব্দাংশ মিলিয়ে তৈরী নতুন শব্দকে বলে 'সঙ্কর শব্দ'। যেমন,

কহতব্য—বাঙলা ধাতু 'কহ্' + সংস্কৃত প্রত্যয় 'তব্য'

নিখরচা—বাঙলা উপসর্গ 'নি' + ফারসী শব্দ 'খরচ'

মাস্টারী—ইংরেজী শব্দ Master + বাঙলা প্রত্যয় 'ঈ'

'অকাট্য'—সংস্কৃত উপসর্গ 'অ' + বাঙলা ধাতু 'কাট্' + সংস্কৃত প্রত্যয় '-য'

লোকনিরুক্তি (Folk-etymology)

অপরিচিত ও উচ্চারণে অসুবিধাজনক শব্দ কখনো-কখনো সামান্য ধ্বনি-সাম্যের সুযোগে পরিচিত শব্দের সাদৃশ্য লাভ করে। এ-ধরনের শব্দবিকারকে বলে 'লোকনিরুক্তি' বা 'লোক-ব্যুৎপত্তি'। যেমন, ঊর্ণনাভ > ঊর্ণনাভ (মাকড়সা) —'নাভি' থেকে সুতা বেরোয় এই বিশ্বাসে। বিস্ফোটক > বিষফোড়া—'বিষ' শব্দের প্রভাব।

Armchair > আরামচেয়ার—এই চেয়ারে বসা আরামের।

টাকার কুবের > টাকার কুবীর > টাকার কুমীর।

অপূর্ব কথা > অপুরুব কথা > অপরূপ কথা > রূপকথা > উপকথা।

Who come there > হুকুমদার—অশিক্ষিত সেনট্রিদের ভাষায়।

বিষমচ্ছেদ (Metaanalysis)

সাদৃশ্যের জন্যে শব্দের বিশ্লেষণ-বিকৃতি ঘটলে অনেক সময় শব্দের রূপ পরিবর্তিত হয়, কখনো-কখনো নতুন শব্দ বা প্রত্যয়ের উদ্ভব ঘটে। এ-ধরনের বিকৃতিকে বলে 'বিষমচ্ছেদ'। যেমন,

সংস্কৃত 'নবরঙ্গ'/ফারসী 'নারাঙ্গ' > আরবী 'নারাঞ্জ' > প্রাচীন ইংরেজী A

norange (একটি কমলালেবু)> আধুনিক ইংরেজী An orange. একইভাবে : Napron—A napron—An apron.

মৌলিক শব্দ 'অসুর'-এর 'অ—'কে না-বোধক উপসর্গ মনে করায় দেবতা-অর্থে 'সুর' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। 'বিধবা' ও মৌলিক শব্দ—বি (Wi) ধ (do) বা (W)। ভুল বিশ্লেষণ করায় (বি+ধব+আ=না-বোধক উপসর্গ+স্বামী +স্ত্রীত্ববোধক প্রত্যয়) স্বামী অর্থে 'ধব' এবং 'সধবা' 'উদ্ধব' ইত্যাদি শব্দের সৃষ্টি।

ফারসী 'মুহরির' ও 'বগির' শব্দ দু'টির '—র'কে ৬ষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন মনে করায় 'মুহুরি' ও 'বগি' শব্দ দু'টি উৎপন্ন হয়েছে।

'তালব্য' (তালু+য) শব্দটির '—ব্য'কে প্রত্যয় মনে করায় 'পিতৃব্য' শব্দের প্রচলন হয়েছে।

ফরাসী Pese শব্দটির 's'কে বহুবচনাত্মক মনে করায় ইংরেজীতে Pea শব্দের সৃষ্টি হয়েছে।

'সজল' 'সবল' 'সফল' ইত্যাদি শব্দের সাদৃশ্যে অশুদ্ধ কিন্তু বহুপ্রচলিত 'সচল' 'সক্ষম' ও 'সকাতর' শব্দের ব্যবহার।

ভুয়া শব্দ (Ghost Word)

সাদৃশ্য কল্পনায় সৃষ্ট ভিত্তিহীন শব্দকে বলে 'ভুয়া শব্দ'। যেমন,

'প্রোথিত' শব্দটি বাঙলা 'পোঁতা' শব্দের অনুষঙ্গে সৃষ্ট, সংস্কৃতে কোন 'প্রোথ্' ধাতু নেই। এ-রকম দৃষ্টান্ত—আহবান> আবাহন ; নীরাজনা/ নীরমজ্জন> নিরঞ্জন।

ছয়

অর্থ পরিবর্তন

শব্দার্থতত্ত্ব

শব্দের মূল রূপ নিহিত আছে তার অর্থে; ভাষার পরিবর্তন শুধু ধ্বনি এবং শব্দ ও ধাতু-রূপে পরিবর্তন আনে না, শব্দের অর্থেও ঘটায় পরিবর্তন। ভাষাতত্ত্বের যে-শাখায় এই অর্থ পরিবর্তনের বিষয় আলোচিত হয় তাকে বলে শব্দার্থতত্ত্ব বা বাগর্থবিজ্ঞান (Semantics)।

শব্দের অর্থ পরিবর্তন (Semantic Change) প্রক্রিয়ার পশ্চাতে মানবমনের বিচিত্র পরিচয় লুকিয়ে আছে। ভাষার পরিবর্তন তথা ধ্বনির পরিবর্তন শব্দার্থে কিরূপ পরিবর্তন আনে তার একটি কৌতুহলোদ্দীপক দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে :

'আদা' অর্থে সংস্কৃত 'শৃঙ্গবের'/গ্রীক 'জিঙ্গিবেরিস'/লাতিন 'জিঙ্গিবের' শব্দ থেকে সৃষ্টি হয়েছে—১. জাঞ্জিবার (দ্বীপের নাম) ২. ইংরেজী Ginger ৩. স্প্যানিশ Dengue ('ছিনালী') > বাঙলা 'ডেঙ্গু' (রোগের নাম)।

বিলীন অতীতের অনেক চিহ্নই শব্দার্থতত্ত্বে তার আভাস রেখে গেছে। যেমন, 'কলম,' শব্দের মূল অর্থ 'শর' 'খাগ'—এই অর্থসূত্রে শর বা খাগের লেখনীর প্রাচীন কালে ব্যবহৃত নাম ছিলো 'কলম', আধুনিক কালে যে-কোন বস্তুনির্মিত লেখনীর নামও অর্থ পরিবর্তন ক'রে রইলো 'কলম'ই। সংস্কৃত 'দম্পতি' শব্দের মূল অর্থ 'গৃহপতি' গ্রীক dem-s-potis শব্দের অর্থও তাই। তৎকালীন গ্রীক-রোমক সমাজের 'পতি'গণ প্রতাপশালী ও স্বেচ্ছাচারী থাকায় ঐ শব্দ থেকে উৎপন্ন despot শব্দটির অর্থ দাঁড়িয়েছে 'অত্যাচারী'—'স্বৈরাচারী'। Villa শব্দটির মূল অর্থ 'গোলাবাড়ি', সেই থেকে সামন্ত প্রভুদের গোলাবাড়ির দাসগণকে বলা হ'তো Villain, তৎকালীন সামন্ত প্রভুরা সম্ভবত এই দাসদের

দিয়ে প্রজাদের ওপর নির্যাতন চালাতেন, ফলে 'দুর্জন' অর্থে villain শব্দের প্রচলন শুরু হয়।

আধুনিক কাব্যপাঠের জন্যে শব্দার্থতত্ত্বে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কারণ অলঙ্কারমণ্ডিত কাব্যভাষাই কবিতার প্রাণ, আর অলঙ্কার-শাস্ত্র শব্দার্থতত্ত্বেরই আলোচ্য বিষয়।

একটি কথার দ্বিধা থর থর চুড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী ;
একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে,
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি ;
একটি পণের অমিত প্রগল্‌ভতা
মর্তে্য আনিল ধ্রুবতারকারে ধ'রে ;
একটি স্মৃতির মানুষী দুর্বলতা
প্রলয়ের পথ ছেড়ে দিল অকাতরে ।।

[—শাশ্বতী : অর্কেষ্ট্রা]

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের এই কাব্যাংশে ব্যবহৃত শব্দসমূহের তাৎপর্য আভিধানিক অর্থ দ্বারা অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

কথ্যভাষা অভিধানকে অনুসরণ করে খুব কম, তদুপরি মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে ব্যাকরণকে অস্বীকার করার দিকে। আর ভাষায় এমন শব্দের সংখ্যা নিতান্তই সীমিত যার একাধিক অর্থ নেই, তারপর বাক্যে বিশিষ্ট রীতিতে প্রয়োগ করলে তার অর্থে পরিবর্তন আসেই। যেমন, 'বলদ' শব্দটি 'প্রাণীবিশেষ' অর্থ ত্যাগ ক'রে মূর্খ' ও 'নিরীহ ব্যক্তি' অর্থেও প্রযুক্ত হ'তে পারে। এভাবে বিশিষ্ট পদপ্রয়োগরীতির ফলে অনেক শব্দের মুখ্য অর্থকে অতিক্রম করে গৌণ অর্থ প্রাধান্য অর্জন করে।

পাকা আম। পাকা বাড়ি। পাকা রঙ। পাকা ছেলে। পাকা কথা। পাকা কাজ। পাকা হিসেব। পাকা বুদ্ধি। পাকা চোর।

এখানে পাকা শব্দটি যথাক্রমে 'পক্ব, মজবুত, স্থায়ী, বুদ্ধিমান, চরম, উত্তম, নির্ভুল, গভীর, অভিজ্ঞ' অর্থে ব্যবহার হওয়ায় এর মুখ্য ও গৌণ অর্থ নির্ণয় কঠিন হ'য়ে পড়েছে।

অর্থ পরিবর্তনের ধারা

শব্দার্থ পরিবর্তনের প্রধান ধারা তিনটি : অর্থপ্রসার, অর্থসংকোচ ও অর্থসংক্রম।

অর্থপ্রসার

রূপক বা অতিশয়োক্তির প্রভাবে কখন কখনও অর্থের বিস্তৃতি ঘটে, এই পরিবর্তনের নাম 'অর্থপ্রসার' বা 'অর্থবিস্তার'।

সংস্কৃত 'পরশ্চঃ' শব্দের অর্থ 'আগামীকালের পরদিন', কিন্তু ঐ শব্দ থেকে উৎপন্ন বাঙলা 'পরশু' শব্দটি 'আগামীকালের পরদিন' ও 'গতকালের পূর্বদিন' উভয়ই বোঝায়। 'গঙ্গা' শব্দটি থেকে উৎপন্ন 'গাঙ' শব্দটির বর্তমান অর্থ 'যে কোন নদী'। 'লক্ষ্মী' শব্দটি দেবীর নাম থেকে 'শান্তশিষ্ট' অর্থে এখন প্রসারিত হয়েছে। 'কালি' শব্দটির মূল অর্থ 'কালো রঙ', প্রসারিত অর্থ 'কলম দিয়ে লেখার কাজে ব্যবহৃত তরল পদার্থ'—যেমন, লাল কালি, সবুজ কালি ইত্যাদি।

গুন = গো-সম্বন্ধীয়—গরুর নাড়িভুঁড়ির তাঁত—দড়ি।

ধন্য = ধনশালী—সর্বসৌভাগ্যবান।

সাঙ্গ = অঙ্গসমেত—সম্পূর্ণ—সমাপ্ত।

Lord = রুটির তত্ত্বাবধায়ক—পরিবারের প্রধান ব্যক্তি—ঈশ্বর।

দরিয়া = নদী—সমুদ্র।

অনেক শব্দের ভুল অর্থে প্রসার লক্ষ্য করা যায়। যেমন,

আঙ্গিক = অঙ্গ সম্বন্ধীয়—কৌশল (Technique)।

ইতিকথা = অর্থশূন্য বাক্য—ইতিহাস।

কর্মব্যপদেশে = কাজের ছুতায়—কর্মসূত্রে।

পূর্বাহ্নে = সকাল বেলায়—পূর্বে, আগে।

প্রামাণ্য = প্রামাণিকতা—প্রমাণসিদ্ধ।

শায়িত = যাকে শোয়ানো হয়েছে—যে শুয়েছে।

সংজ্ঞা = নাম, পরিভাষা—সংজ্ঞার্থ (Definition)।

স্তিমিত = নিশ্চল, ভেজা—ক্ষীণ।

হৈমবতী = হেমমণ্ডিতা—হিমালয় পর্বত-দুহিতা।

অর্থসংকোচ

শব্দের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে কোন একটি মুখ্য হ'য়ে উঠলে অন্যান্য অর্থের যে বিলুপ্তি ঘটে তাকে 'অর্থসংকোচ' বলে। যেমন,

অন্ন = খাদ্য > ভাত = খাদ্যবিশেষ।

সন্দেশ = কুশলবার্তা বিনিময় উপলক্ষ্যে আত্মীয়গৃহে মিষ্টান্ন উপহার—মিষ্টান্ন বিশেষ।

সিধা = সিদ্ধ ক'রে খাওয়ার দ্রব্যাদি—ব্রাহ্মণের অপক্ক খাদ্যসম্ভার।

জলপানি = লঘু আহার—মেধাবী ছাত্রের বৃত্তি।

মৃগ = যে কোন পশু (যেমন, মৃগেন্দ্র, মৃগয়া, শাখামৃগ)—হরিণ।

মুর্গ = যে কোন পাখি (দ্রষ্টব্য 'শিমুর্গ'—শাহনামা)—মোরগ-মুরগী।

Meat = যে-কোন খাদ্য (যেমন, sweetmeat)—মাংস।

ধূম্র = ধোঁয়াটে—ধোঁয়া (ভুল অর্থে সংকোচ)।

অর্থসংক্রম

অর্থের ক্রমপ্রসার ও ক্রমসংকোচের ফলে কখন কখনও কোন শব্দের এমন অর্থ তৈরী হয় যার সঙ্গে মূল অর্থের সংযোগ নির্ণয় কঠিন হ'য়ে পড়ে। একে 'অর্থসংক্রম' বা 'অর্থসংশ্লেষ' বলে। যেমন,

সহসা = মূল অর্থ 'সবলে'—অর্থপ্রসার 'অবিমৃষ্যকারিতা'—অকস্মাৎ।

ঘর্ম = গরম—ঘাম।

পাষণ্ড = ধর্মসম্প্রদায়—অন্য ধর্মসম্প্রদায়—বিরুদ্ধ ধর্মসম্প্রদায়—বিরুদ্ধ ধর্মাচারী ব্যক্তি—ধর্মজ্ঞানহীন, অত্যাচারী ব্যক্তি।

পাত্র = পানাধার—আধার—কন্যাসম্প্রদানের আধার (বর)।

শের = সিংহ—বাঘ।

World = প্রাচীন মানুষ—প্রাচীন মানুষের বাসস্থান—পৃথিবী।

Bellum = সুন্দর (যেমন, Belle = সুন্দরী তরুণী) > Belligerency = যুদ্ধের ইচ্ছা।

Heathen = পার্বত্য গুহাবাসী—অদীক্ষিত, ম্লেচ্ছ।

শুশ্রূষা = জানার ইচ্ছা—সেবা।

অর্থ পরিবর্তনে শব্দালংকার, সুভাষণ রীতি ও অর্থ-বিভিন্নতা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে ব'লে তা স্বতন্ত্র আলোচনায় উপস্থাপিত করা হ'লো।

অলংকার

শব্দসৃষ্টির মূলে অর্থের ভূমিকাই প্রধান, মানুষ কোন কিছুর নামকরণ করে তার গুণাত্মক বৈশিষ্ট্যের দিকে ইংগিত দিয়ে। এখানেই নিহিত আছে বাক্-অলংকার-প্রয়োগের মূল কারণ। অলংকারের বিস্তৃতি ঘটলে অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে। যেমন,

বর = কন্যা-নির্বাচনকারী—কন্যা-নির্বাচনকারী বিবাহার্থী—বিবাহার্থী, সদ্যো-বিবাহিত, স্বামী।

শ্বাপদ = যার পা কুকুরের মত—শিকারী বা মাংসাশী পশু।

ক্রিয়াকলাপ = ময়ূরপুচ্ছের মত বর্ণাঢ্য কাজ—কাজকর্ম।

উদর = জলপাত্র—পেট।

পেট—বস্তা (দ্রষ্টব্য 'বাক্সপেটরা')—উদর।

বনস্পতি = বনের বৃহত্তম বৃক্ষ—বৃহত্তম বৃক্ষ।

দারুণ = দারু (কাঠ) নির্মিত—দারুনির্মিত দ্রব্যের মত কঠিন—অত্যন্ত কঠিন—অত্যন্ত।

গবাক্ষ = গরুর চোখ—জানালা।

গোষ্ঠী = অনেক গরু যেখানে থাকে—সমূহ।

সগোত্র = এক গোয়ালে গরু রাখা—এক সম্প্রদায়।

উদ্বেল = বেলাভূমি অতিক্রান্ত—ব্যাকুল।

স্তম্ভিত = স্তম্ভের দশাপ্রাপ্ত—বিস্মিত।

জোয়া = লোহ—সধবাসূচক লক্ষণ।

কমলা = পর্যাপ্ত সুখযোগের দ্বারা যিনি কামদান করেন (দেবী)—যে পর্যাপ্ত রসদান করে (ফলবিশেষ)।

অজগর = ছাগভোজী—বড় সাপ।

বাঙলা ভাষায় রূপক-আরোপিত বহু শব্দের প্রচলন রয়েছে। যেমন, হাত—হাতি, হাতা, হাতানো ; পা—পায়া ; চোখ—চোখা ; হাঁড়ি—হেঁড়ে ; জল—জ'লো ; ভাত—ভাতা ; ছাত—ছাতা ; আম—আমসী ইত্যাদি।

সুভাষণ-রীতি

অশুভ বা নিন্দিত অর্থের ভদ্র প্রকাশই 'সুভাষণ-রীতি'। যেমন, 'ঘরে চাল নেই' অর্থে 'ঘরে চাল বাড়ন্ত', বিদায়কালে 'যাই' অর্থে 'আসি' ব্যবহার।

সুভাষণ-রীতি প্রযুক্ত অনেক শব্দই কালক্রমে হীনার্থক হ'য়ে পড়েছে। যেমন,

নাগর = নগরবাসী বিদগ্ধ ব্যক্তি—অবৈধ প্রেমিক।

রাম = মহাকাব্যের দেবতুল্য নায়ক—হীনার্থে প্রয়োগ : রামছাগল, রামদা, রামবোকা, রামখোকা।

মহাজন = মহান ব্যক্তি—কুসীদজীবী ব্যক্তি, আড়তদার।

অর্থ-বিভিন্নতা

অর্থ পরিবর্তনে যে বৈচিত্র্য তা অর্থ-বিভিন্নতায় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। একটি মূল শব্দ বা ধাতু থেকে দুই বা ততোধিক শব্দ সৃষ্টি হ'লেও যদি তাদের অর্থ-পার্থক্য থাকে তবে একে 'অর্থ-বিভিন্নতা' নামে চিহ্নিত করা যায়। এই ধরনের যমক (doublet) সৃষ্টিতে লোকনিরুক্তির প্রভাবই সমধিক। যেমন,

{ Lamp = বৈদ্যুতিক বাতি।
{ লম্প = তেলের বাতি।

{ পুস্তক = মুদ্রিত গ্রন্থ।
{ পুথি = হস্তলিখিত গ্রন্থ, বিশেষ ধরনের গ্রন্থ।

{ Negro = কৃষ্ণকায় জাতি।
{ Nigger = গালি বিশেষ।

লাতিন° Dignitus > { Dignity = মর্যাদা, সম্ভ্রম, মহত্ত্ব।
{ Dainty = সুস্বাদু, পরিপাটি।

ভাষা ঃ শ্রেণীবিভাগ

ভাষাতাত্ত্বিকগণ প্রচলিত ও বিলুপ্ত ভাষাগুলিকে এই দু'টি পৃথক মানদণ্ড দ্বারা বিচার ক'রে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন :

১. রূপতাত্ত্বিক বা ব্যাকরণগত বা বাক্যবিন্যাসমূলক শ্রেণীবিভাগ (Morphological/Syntanctical Classification)

২. বংশানুক্রমিক বা ঐতিহাসিক শ্রেণীবিভাগ (Genealogical/Historical Classification)

অপর দু'টি শ্রেণীবিভাগ-পদ্ধতি অবৈজ্ঞানিক বিধায় বর্তমানে পরিত্যক্ত হয়েছে—১. ভৌগোলিক-পদ্ধতি (Geographical Classification) ও ২. নৃতত্ত্ব-সম্মত পদ্ধতি (Racial Classification)। বস্তুত ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী ভাষাবিন্যাসের সঙ্গে ভাষাতত্ত্ব মোটেই সম্পর্কিত নয়। ভাষা ও ভাষাগোষ্ঠীর বিস্তার কোন ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ থাকে না। ভারতীয় আর্যভাষা ও বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের ইংরেজী ভাষা একই ভাষা-পরিবারের সদস্য হ'লেও অবস্থান অনুযায়ী তারা দুই ভাষামণ্ডলের অন্তর্গত। কাজেই ভৌগোলিক অবস্থান বিচার দ্বারা ভাষার প্রকৃত শ্রেণীবিভাগ করা যায় না। নৃতত্ত্ব-সম্মত পদ্ধতি ও এই ভ্রান্ত ধারণার ওপর নির্ভরশীল ছিল, বস্তুত মানবগোষ্ঠী ও ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। জাতি-মিশ্রণের ফলে ভিন্ন ভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মানুষ যেমন একই ভাষা-সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছে, তেমনি একই মানবগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন ভাষা-সম্প্রদায়ও রয়েছে। বিশেষ ভাষা-বিশিষ্ট আদি মানবপরিবার যদি একটি ভৌগোলিক অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকতো তবে ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী মানবগোষ্ঠী তথা ভাষাগোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ সম্ভব ছিল।

রূপতাত্ত্বিক শ্রেণীবিভাগ

ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ বাক্য ও পদ-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাষাগুলির স্বরূপ নির্ণয় ক'রে তদনুযায়ী শ্রেণীবিভাগকে বলে 'রূপতাত্ত্বিক শ্রেণীবিভাগ'।

এই পদ্ধতি অনুযায়ী ভাষাগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে : অজৈব ও জৈব।

ক. অজৈব ভাষা (Inorganic Languages)

যে সমস্ত ভাষায় পদের অবস্থানই বাক্যের অর্থ নিয়ন্ত্রণ করে এবং পদের অন্তঃস্থ ও বাহ্য কোন পরিবর্তন ঘটে না, তাদের 'অজৈব ভাষা' বলে। ব্যাকরণ-সংগঠনহীন অজৈব ভাষাকে 'অসমবায়ী' (Isolating) ও 'অবস্থানিক' (Positional) ভাষাও বলা হয়। চীনা ভাষা এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ, যেমন :

ঙ্গো	ত	নি	=	আমি মারি তোমাকে
নি	ত	ঙ্গো	=	তুমি মার আমাকে

চীনা ভাষায় বাক্যে অবস্থান অনুযায়ী একটি পদ কখনো 'বিশেষ্য' কখনো 'বিশেষণ' কখনো 'ক্রিয়া' কখনো 'ক্রিয়া বিশেষণ' হয়।

খ. জৈব ভাষা (Organic Languages)

যে সমস্ত ভাষায় বাক্য সংগঠনে পদের অন্তঃস্থ পরিবর্তন ঘটে এবং উপসর্গ বা অনুসর্গ যুক্ত হ'য়ে পদের বাহ্যিক পরিবর্তন আনে তাদের জৈব ভাষা বলে। পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষাই এর অন্তর্গত।

জৈব ভাষাসমূহকে আবার তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে :

১. সর্বসমবায়ী ২. যৌগিক ৩. সাধিত।

১. সর্বসমবায়ী ভাষা (Incorporating/Polysynthentic/Holophrastic Languages)

যে সমস্ত ভাষায় মূল শব্দসমূহ সংযোজন বা মিশ্রণ বা অন্তর্বয়নের ফলে লোপ পেয়ে যায় তাদের সর্বসমবায়ী ভাষা বলে। গ্রীনল্যাণ্ডের ভাষায় এর উদাহরণ মেলে। যেমন, aulisariartorasuarpok (He hastens to go fishing) এই 'শব্দবাক্যটি' (sentence-word) aulisar (to fish), peartor (to be engaged in) ও pinnesuarpok (he hastens)—এই তিনটি শব্দের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে।

সর্বসমবায়ী ভাষায় তাই দু'টি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়—(ক) শব্দ-বাক্য ও (খ) সংমিশ্রণের সময় শব্দের এক বা একাধিক অক্ষরের লোপ। চেরোকী

ভাষায় এর উদাহরণ পাওয়া যায়—naten (bring) + amokol (canoe) + nin (to us) = nadholinin.

কোন-কোন ভাষায় সর্বসমবায়ী ভাষার আংশিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এইসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে : শব্দবাক্য গঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও সর্বনামের মিশ্রণ। বাস্ক ভাষায় উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সঙ্গে সর্বনামের এরূপ মিশ্রণ থাকে। যেমন,

dakarkiot (I carry it to him)

narkarsu (though carriest me)

hakart (I carry thee)

আংশিক সমবায়ের উদাহরণ বিভিন্ন ভাষার কথ্যরূপে মেলে ইংরেজীতে is not পরিণত হয় ain't-এ, ফরাসী n'est-ce pas হয়, 'spas, বাঙলায় 'যা ইচ্ছা তাই' থেকে 'যাচ্ছেতাই'।

২. যৌগিক ভাষা (Agglutinating Languages)

যে সমস্ত ভাষায় উপসর্গ, অনুসর্গ প্রভৃতি যোগে পদের রূপসাধনগত পরিবর্তন ঘটলেও তার মূলরূপ স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে তাদের 'যৌগিক ভাষা' বলে। তুর্কী ভাষা এর বিশিষ্ট উদাহরণ। যেমন,

sev-mek (to love)

sev-me-mek (not to love)

sev-in-mek (to love oneself)

sev-il-mek (to be loved)

sev-ish-mek (to love one another)

sev-dir-mek (to cause one to love)

sev-dir-il-mek (to be brought to love)

sev-in-dir-il-mek (to be made to rejoice)

sev-ish-dir-il-mek (to be brought to love one another)

sev-ish-dir-il-me-mek (not to be brought to love one another)

কৃত্রিম আন্তর্জাতিক ভাষা এসপেরানটো-তেও এমনি প্রয়োগ দেখা যায় :

Kat-o (a cat)

Kat-in-o (a female cat)

Kat-id-o (a kitten)

Kat-id-et-o (a small kitten)

Kat-in-et-id-o (the kitten of a small female cat)

যৌগিক ভাষাকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে—উপসর্গ-যৌগিক ও অনুসর্গ-যৌগিক।

ক. যে সমস্ত যৌগিক ভাষায় বাক্যস্থিত পদের মূল্যনির্দেশক চিহ্নগুলি মূল শব্দের আগে আলগাভাবে যুক্ত থাকে তাদের 'উপসর্গ-যৌগিক ভাষা' বলে। বানটু গোষ্ঠীর ভাষায় এ-ধরনের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কাফির ভাষা থেকে উদাহরণ :

umuntu	wetu	omuchle	uyabonakala
মানুষ	আমাদের	সুন্দর	দেখতে

এই বাক্যের বহুবচন নিম্নরূপ ঃ

abantu	betu	abachle	bayabonkala

খ. যে সমস্ত যৌগিক ভাষায় বাক্যস্থিত পদের মূল্যনির্দেশক চিহ্নগুলি মূল শব্দের শেষে যুক্ত হয় তাদের 'অনুসর্গ-যৌগিক ভাষা' বলে। তুর্কী, উরাল, আলতাই ও দ্রাবিড় ভাষায় এরূপ বৈশিষ্ট্য মেলে। (তুর্কী ভাষার উদাহরণ পূর্বেই দে'য়া হয়েছে) তামিল ভাষা থেকে উদাহরণ :

পলন্ (কর্তায় ১মা)

পলনে (সম্বোধনে '-এ' বিভক্তি)

পলনেই (কর্মকারকে '-এই' বিভক্তি)

পলনুদেইয় (সম্বন্ধে '-উদেইয়' বিভক্তি)

পলন্‌গল্ (বহুবচনে '-গল্' বিভক্তি)

এ ছাড়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলি হয়ে মাদাগাসকার পর্যন্ত এলাকার অনেক ভাষাতে উপসর্গ-যৌগিক ও অনুসর্গ-যৌগিক-এর মিশ্রন দেখা যায়। এদের মধ্যে মালয়ান ভাষা অন্যতম। আবার পলিনেশীয় গোষ্ঠীর ভাষা অংশত যৌগিক।

৩. **সাধিত ভাষা (Inflecting Languages)**

যে সমস্ত ভাষায় প্রত্যয়, বিভক্তি ইত্যাদি সম্পর্কসূচক চিহ্নগুলি শব্দের আগে, পরে ও মধ্যে যে কোন স্থানে বসে এমনভাবে মিশে যায় যে তাদের সহজে চেনা যায় না—সেইসব ভাষাকে বলে সাধিত বা **সমন্বয়ী** (Inflecting) বা সংশ্লিষ্ট (Synthetic) ভাষা। যেমন, আরবী, সংস্কৃত, হিব্রু ও লাতিন ভাষা।

আরবী √qtl থেকে পাওয়া যায় :

qatala (he killed)
qutila (he was killed)
yaqtulu (he kills)
qatil (killing)
qitl (enemy)
qital (a blow)

সংস্কৃত 'প্রাবিশৎ' শব্দটির সৃষ্টি এভাবে :

প্র + অ + বিশ্‌ + অ + ত্‌

(উপপদ + আগম + মূল ধাতু + বিকরণ + অতীত—লঙ ১ম পুরুষ একবচনের ধাতু-বিভক্তি বা প্রত্যয়)

বৈশ্লেষিক ভাষা :

সাধিত ভাষাসমূহ সংশ্লিষ্টতা গুণ হারিয়ে অনেক সময় **'বৈশ্লেষিক'** (Analytical) হয়ে ওঠে। এই বৈশ্লেষিক ভাষার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে ডঃ শহীদুল্লাহ বলেছেন—When a language loses its inflectional character and indicates grammatical relations by means of particles ......it is become Analytical.

বাঙলা ও ইংরেজী এ-জাতীয় ভাষা। এ-সব ভাষা অব্যয় বা উপসর্গ বা প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত শব্দের সাহায্যে ব্যাকরণগত সম্পর্কের ইংগিত পাওয়া যায়।

টীকা ১.

রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতি অনুসরণ করে ভাষাতত্ত্ববিদগণ অনেকগুলি শ্রেণীর নাম প্রস্তাব করেন বটে কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত ভাষার সন্তোষজনক শ্রেণীবিভাগে

তাঁরা সন্তোষজনক সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। এই ব্যর্থতার কারণ প্রসঙ্গে 'Language' গ্রন্থে এডওয়ার্ড স্যাপির বলেছেন : ব্যাকরণগত শ্রেণীবিভাগের প্রথম অসুবিধা এমন অনেক ভাষা, যাদের মধ্যে একাধিক শ্রেণীর লক্ষণ প্রায় সমমাত্রায় বিদ্যমান—'A language may be both Agglutinative and Inflective, or Inflective and Polysynthetic, or even Polysynthetic and Isolating.'

দ্বিতীয় অসুবিধা : শ্রেণীবিন্যাসকারী পণ্ডিতগণ নির্বাচিত সামান্য কিছু ভাষাকে সামনে রেখে বিভাজন ক্রিয়া শুরু করতে বাধ্য হন।

তৃতীয় অসুবিধা : ভাষাতাত্ত্বিকগণ সবসময় শ্রেণীবিভাগের জন্যে সহজতম প্রক্রিয়া উদ্ভাবনে সচেষ্ট থাকেন।

টীকা ২.

'জৈব' ও 'অজৈব' শ্রেণীবিভাগ প্রথম করেন শ্লেগেল ভ্রাতৃদ্বয়। শ্লেইশের ভাষাসমূহকে করেন তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—'অজৈব', 'যৌগিক' ও 'সাধিত'। এর সঙ্গে ফন হামবোল্ড 'সর্বসমবায়ী' এই চতুর্থ শ্রেণীতে যুক্ত করেন।

বংশানুক্রমিক শ্রেণীবিভাগ

পৃথিবীর ভাষাসমূহের প্রাচীন ইতিহাস ও পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আবিষ্কৃত তথ্য অবলম্বনে তাদের কয়েকটি বংশক্রমে বিন্যস্ত করাকেই **বংশানুক্রমিক শ্রেণীবিভাগ** বলে।

আজ পর্যন্ত এই পদ্ধতির শ্রেণীবিভাগকেই বাস্তব, উপযুক্ত ও প্রকৃত মনে করা হয়। তবে এই পদ্ধতির সার্থকতাও সর্বাঙ্গীন নয়, কারণ—

১. অনেক ভাষার প্রাচীন নিদর্শন লুপ্ত বলে তাদের ইতিহাস এখনো অনাবিষ্কৃত।

২. মেসোপোটেমিয়ার প্রাচীন ভাষা 'সুমেরীয়' (৪০০০ খৃ-পূ) ও 'মিতাননি' (১৬০০ খৃ-পূ), ইরানের 'এলামীয়' (২০৭০ খৃ-পূ), ক্রীট দ্বীপের প্রাচীন ভাষা (১৫০০ খৃ-পূ), ইতালির 'এতরুসকান' (৬০০ খৃ-পূ) ইত্যাদি লুপ্ত ভাষা এবং স্পেনের 'বাস্ক', আফ্রিকার 'বুশম্যান' ও 'হটেনটট', জাপানী, কোরিয়ান,

অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের ভাষা ইত্যাদি আধুনিক ভাষাকে কোন বংশবন্ধনে বাঁধা যায়নি।

প্রধান ভাষাগোষ্ঠীসমূহ

বংশানুক্রমিক শ্রেণীবিভাগের পদ্ধতি দ্বারা পৃথিবীর সব ক'টি ভাষাকে বিচার বিশ্লেষণ করে মোট ১৯টি বংশ বা গোষ্ঠী নির্ধারণ করা হয়েছে :

১. ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo-European)

২. সেমীয়-হামীয় (Semitic-Hamitic)
এই বংশের উল্লেখযোগ্য দু'টি ভাষা—আরবী ও হিব্রু।

৩. বান্টু (Bantu)
এই বংশে রয়েছে সোয়াহিলি, জুলু, কাফির প্রভৃতি মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকার ভাষাসমূহ।

৪. ফিননো-উগরীয় (Finno-Ugric)
এই বংশের ভাষা—ফিনিশ, এসথোনীয়ান ও মাজ্যর।

৫. তুর্ক-মঙ্গোল-মানচু (Turk-Mongol-Manchu)
এই বংশের ভাষা—তুর্কী, তাতার, কিরঘিজ, উযবেগ, তুঙ্গুস, মানচু ইত্যাদি।

৬. ককেশীয় (Caucasian)
উল্লেখযোগ্য ভাষা—জর্জীয়।

৭. দ্রাবিড় (Dravidian)
উল্লেখযোগ্য ভাষা—তেলেগু, তামিল, কানাড়ী, মালয়ালম্‌ ও ব্রাহুই।

৮. অসট্রিক (Austric)

৯. চীনা-তিব্বতীয় (Sino-Tibetan)
এই বংশের প্রধান ভাষা—চীনা, সিয়ামিজ, তিব্বতী ও বারমিজ।

১০. উত্তর-পূর্ব সীমান্ত (Hyperborean)
উল্লেখযোগ্য ভাষা—চুকচী।

১১. এস্কিমো (Esquimo)
আদিম আমেরিকান
এই শ্রেণীতে রয়েছে ৮টি ভাষাগোষ্ঠী :

১২. আলগঙ্কিয়ান
১৩. আথাবাসকান
১৪. ইরোকোয়িয়ান
১৫. মুসকোজিয়ান
১৬. সিওউয়ান
১৭. পিমান
১৮. শোশোনিয়ান
১৯. নাহুয়াটলান। 'নাহুয়াটলান' গোষ্ঠীর অন্তর্গত রয়েছে ঐতিহ্যবাহী আযটেক ভাষা।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী

বাঙলা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর এক বংশধর ভাষা। এই ভাষাগোষ্ঠীর ক্রমবিবর্তনের মাঝেই বাঙলা ভাষার স্থান নির্ণীত হয়েছে।

যে-মূলভাষা থেকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর উদ্ভব তার নিদর্শন লুপ্ত। তবে এই গোষ্ঠীর প্রাচীন ভাষাগুলির তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে মূলভাষার একটি রূপ কল্পনা করে নেয়া হয়েছে। তবে মূলভাষার আনুমানিক উদ্ভবকাল নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সিদ্ধান্ত আনুমানিক ৫০০০ খৃস্টপূর্বাব্দ, ডঃ সুকুমার সেনের ২৫০০ খৃস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ের কথা বলেন।

হিট্টি ভাষা আবিষ্কারের পর প্রথমে তাকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বংশের শাখা মনে করা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তার রূপের প্রাচীনতা বিশ্লেষিত হ'লে তাকেই আদি মূলভাষা বলে গণ্য করা হয়।

এই আদি মূলভাষা (ইন্দো-হিট্টি) থেকে প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বংশের উদ্ভব। এর আনুমানিক উদ্ভবকাল, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, ৩৫০০ —২৫০০ খৃস্টপূর্বাব্দ।

কণ্ঠ্যধ্বনির উচ্চারণগত বৈষম্য অনুযায়ী ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীকে কেন্তুম ও শতম্—এই দুটি বৃহৎ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আনুমানিক ৩৫০০ খৃস্টপূর্বাব্দ থেকে শতম্ গুচ্ছের ভাষায় স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়।

শতম্‌ গুচ্ছের একটি শাখা ইন্দো-ইরানীয় বা আর্য। এর উদ্ভবকাল আনুমানিক ২৫০০ খৃস্টপূর্বাব্দ। এই আর্য-সম্প্রদায় ইরান থেকে ভারতে আসে, এবং কালক্রমে ভারতে তারা নিজস্ব ভাষা-বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিক নিয়মেই স্থাপন করে। এ-ভাবে সৃষ্টি হয় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা। এই ভাষার (১২০০—৮০০ খৃস্টপূর্বাব্দ) নিদর্শনগত কালানুক্রমিক স্তর তিনটি: বেদ, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ। বেদে যে ভাষারূপ দেখা যায় তা সাহিত্যিক ভঙ্গিবিশিষ্ট, এ-রকম বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ অপর ভাষা হচ্ছে সংস্কৃত, যাকে পাণিনি প্রমুখ বৈয়াকরণগণ শোধিত ক'রে গড়ে তোলেন। জনগণের কথ্য ভাষা ছিলো প্রাকৃত, যার নাম দেয়া হয়েছে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা (৫০০—২০০ খৃস্টপূর্বাব্দ)। এর রয়েছে তিনটি স্তর—আদি, মধ্য ও অন্ত্য। এই শেষ স্তর অর্থাৎ অর্বাচীন অপভ্রংশ বিভিন্ন প্রদেশে কালগত ও স্থানগত কারণে রূপান্তরিত হয়ে নব্যভারতীয় আর্যভাষায় (৫০০—২০০ খৃস্টপূর্বাব্দ) পরিণত হয়। এই ভাষাগোষ্ঠীর গৌড় এলাকার শাখার নাম গৌড়ী প্রাকৃত (২০০ খৃস্টপূর্বাব্দ—৪৫০ খৃষ্টাব্দ), তার বিবর্তিত রূপ গৌড়ী অপভ্রংশ (৪৫০—৬৫০ খৃস্টাব্দ)। গৌড়ী অপভ্রংশ থেকে বিহারী, উড়িয়া ও বঙ্গকামরূপী ভাষার উদ্ভব। এই বঙ্গকামরূপী ভাষা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বাঙলা (৬৫০ খৃস্টাব্দ) ও অসমিয়া ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে।

যে বিবর্তনের পথ বেয়ে বাঙলা ভাষার উদ্ভব তা একটি বংশানুক্রমিক তালিকায় দেখানো যেতে পারে:

- আদি মূলভাষা (ইন্দো-হিট্টি) (৫০০০ খৃঃ পূঃ)
  - ইন্দো-ইউরোপীয় (৩৫০০—২৫০০ খৃঃ পূঃ)
    - কেন্তম্
    - শতম্ (২৫০০—২০০০ খৃঃ পূঃ)
      - আর্য (ইন্দো-ইরানীয়) (২০০০—১২০০ খৃঃ পূঃ)
        - ভারতীয় আর্য
          - বৈদিক
          - প্রাচীন ভারতীয় আর্য (১২০০—৮০০ খৃঃ পূঃ)
            - মধ্যভারতীয় আর্য
              - পালি
              - প্রাকৃত (৫০০—২০০ খৃঃ পূঃ)
              - অশোক-অনুশাসন
            - সংস্কৃত

মধ্যভারতীয় আর্য

|

গৌড়ী প্রাকৃত
(২০০ খৃঃ পূঃ—৪৫০ খৃঃ)

|

গৌড়ী অপভ্রংশ
(৪৫০—৬৫০ খৃঃ)

|

- বিহারী
- উড়িয়া
- বঙ্গকামরূপী
  - বাঙলা (৬৫০ খৃঃ)
  - অসমিয়া

পরিশিষ্ট

১. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর কেনতুম শাখা :

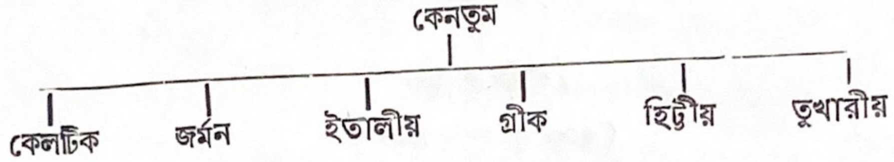

কেলটিক ভাষাগোষ্ঠী

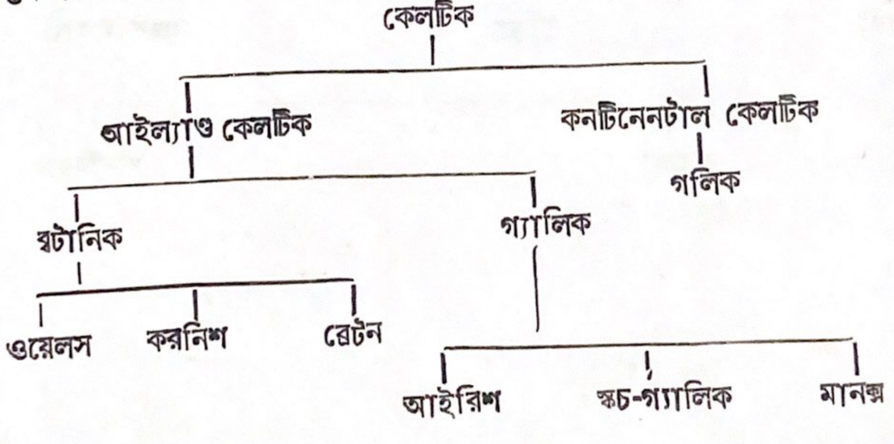

জর্মন ভাষাগোষ্ঠী

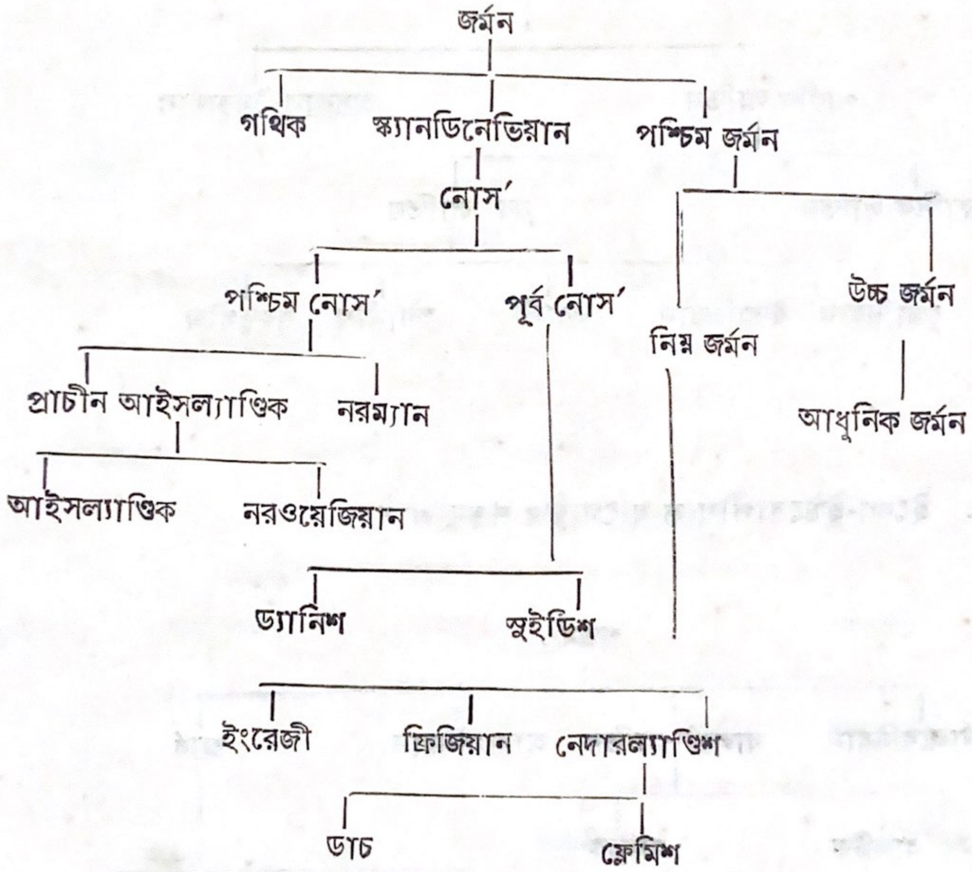
জর্মন
গথিক
স্ক্যানডিনেভিয়ান
পশ্চিম জর্মন
নোর্স
পশ্চিম নোর্স
পূর্ব নোর্স
উচ্চ জর্মন
নিম্ন জর্মন
প্রাচীন আইসল্যাণ্ডিক
নরম্যান
আধুনিক জর্মন
আইসল্যাণ্ডিক
নরওয়েজিয়ান
ড্যানিশ
সুইডিশ
ইংরেজী
ফ্রিজিয়ান
নেদারল্যাণ্ডিশ
ডাচ
ফ্লেমিশ

ইতালীয় ভাষাগোষ্ঠী

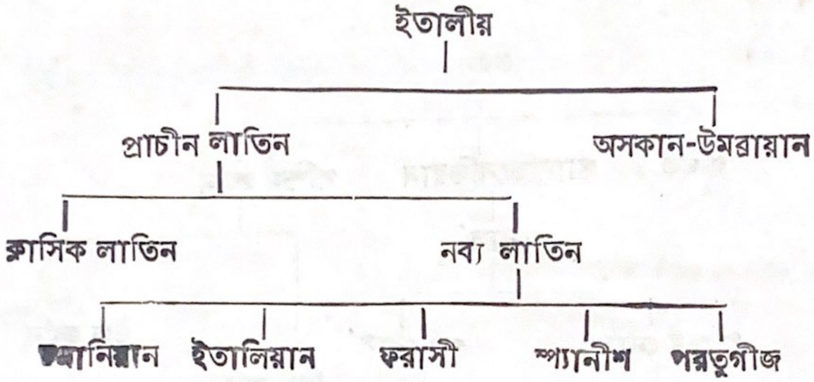

২. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর শতম্ শাখা

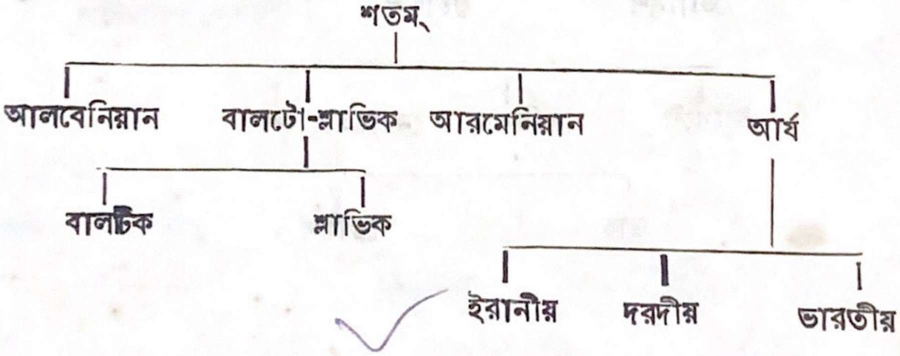

প্রাকৃত ভাষাগোষ্ঠী

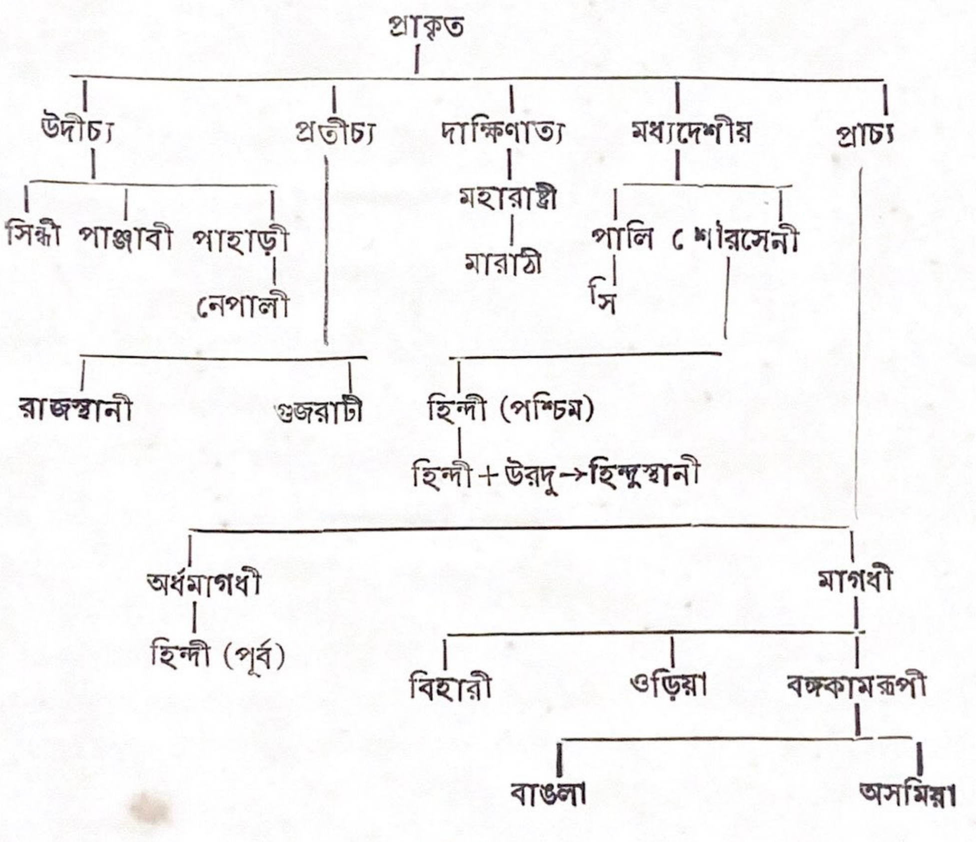
প্রাকৃত
উদীচ্য
প্রতীচ্য
দাক্ষিণাত্য
মধ্যদেশীয়
প্রাচ্য
সিন্ধী
পাঞ্জাবী
পাহাড়ী
নেপালী
মহারাষ্ট্রী
মারাঠী
পালি
শৌরসেনী
সি
রাজস্থানী
গুজরাটী
হিন্দী (পশ্চিম)
হিন্দী + উরদু → হিন্দুস্থানী
অর্ধমাগধী
মাগধী
হিন্দী (পূর্ব)
বিহারী
ওড়িয়া
বঙ্গকামরূপী
বাঙলা
অসমিয়া

—